ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম
ও
অনুশীলন সমিতি

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত

অনুশীলন সমিতি
৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি

প্রকাশক :

দীনেশচন্দ্র ঘটক

সাধারণ সম্পাদক

অনুশীলন সমিতি

৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি

২ গ্রীক চার্চ রো এক্সটেনশন

কলকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রক :

পরেশ গুহ

ক্রান্তি প্রেস

৩৭ রিপণ ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০১৬

মূল্য : চার টাকা

প্রকাশন : ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭

প্রকাশকের নিবেদন

দুঃসাহসী মরণ-আলিঙ্গনেব দুর্জয় অভিযানেব মুহূর্তেও একফোঁটা চোখের জলের সমবেদনা যাঁদের জোটেনি, প্রশংসার বরণডালা যাঁদের কণ্টকদীর্ণ যাত্রাপথকে আলোকোজ্জ্বল করেনি, যাঁদের আত্মবলিদানের সুমহান কীর্তি বন্দনা-গানের ছন্দে ঝংকৃত হয়ে ওঠে নি দেশমাতার সেই অনাদৃত, উপেক্ষিত, অকীর্তিত, বে-হিসেবী দুর্বিনীত সন্তানদের কথা আজকের এবং আগামী দিনের তরুণদের কাছে বলে যাওয়ার একটা আকুতি অগ্নিযুগের বিপ্লবী-মহলকে দীর্ঘদিন আলোড়িত করছিল। এ সম্পর্কে খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা হয় নি, একথা বলা যায় না। তবু কোথায় যেন একটা অভাব, অনেকখানি বা অসঙ্গতি ঐ সব সাধু প্রকল্পকেও বিড়ম্বিত করেছে। বিগত ১৬ই মার্চ, ১৯৭৬ দোল পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রবীণ বিপ্লবীদের এক সমাবেশ ঘটেছিল ভাবত সভা হলে। সকল পরিস্থিতি নানা দিক থেকে বিবেচনা করে তথায় গঠিত অনুশীলন সমিতি ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উপর বাস্তব ইতিহাসসম্মত একটি গ্রন্থ প্রকাশনার ভার দেওয়া হয়। সে দায়িত্ব কমিটি মাথা পেতে গ্রহণ করে।

বর্তমান গ্রন্থের রচনাকার শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত সেদিনের আগুনের খেলার একজন কৃতী শিল্পী। দীর্ঘ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে প্রবীণ বিপ্লবী নায়কদের 'সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ও দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডপত্র মন্থন করে প্রচুর পরিমাণ অজ্ঞাত, অশ্রুত তথ্য এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশনার ভার কমিটি সাগ্রহে হাতে নেয়। গ্রন্থে বর্ণিত বিপ্লবকর্মের কাহিনী যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথা তুলে দাঁড়াবার ব্রতে কিছুটা

পরিমাণেও উদ্বুদ্ধ করে তবেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব। লেখক এই গ্রন্থের বিক্রয়লভ্য সমস্ত অর্থ ও তার সকল স্বত্ব কমিটিকে অর্পণ করেছেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

নিবেদক

দীনেশচন্দ্র ঘটক

সাধারণ সম্পাদক

অনুশীলন সমিতি

৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭

সূচনা

ভারতে নবজাতিগঠনের মন্ত্রদাতা ঋষি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন আহ্বান করেছিলেন বাঙালী জাতিকে এবং বাঙালী জাতির মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবাসীকে। ভারতবাসী আপামর সাধারণকে ডেকে শুনিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের বাণী—"দেশ-সেবকের মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, বধূ নাই, গৃহ নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই।" এই সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা জন্মভূমিই তার একমাত্র মাতা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জন্মভূমি দেশমাতার সন্ধানে তিনি কালসমুদ্রে ডুবেছিলেন, আকুল আহ্বানে ডেকেছিলেন মাকে—কোথা মা? কই আমার মা? এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথা তুমি?

মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী জননী জন্মভূমি সেদিন একবার প্রত্যক্ষ হয়েই আবার কালসমুদ্রে ডুবেছিলেন। বঙ্কিমের আকুল আহ্বানে জননী জন্মভূমি আর সাড়া দেন নাই। তাই বঙ্কিম ডেকেছিলেন সেদিন এই গৃহহীন আত্মীয়হীন দেশসেবকদের। ডেকে বলেছিলেন তাদের—এস ভাই সকল, আমরা এই কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। বলেছিলেন সবাইকে—ভয় কি? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? ডেকেছিলেন সবাইকে কালস্রোতে নিমজ্জিতা স্বর্ণপ্রতিমা বঙ্গমাতা ভারতমাতাকে তুলে আনবার জন্য।

এই আহ্বানবাণী শুনেছিলেন সেদিন বাংলার মাতৃসেবকের দল। বঙ্কিমের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়েই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনুশীলন সমিতি। গড়ে তুলেছিলেন মায়ের পূজামণ্ডপ। সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, জীবন বিপন্ন করেও তাঁরা কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা মাকে তুলে আনবেন।

বঙ্কিমের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সজলনয়নে সেদিন কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন মাতৃসেবকের দল—ওঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! ওঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎ পথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব।' কিন্তু ঐ কাতর আবেদনেও মা সেদিন সাড়া দেন নাই। বঙ্কিম বলেছেন, মা উঠলেন না। প্রশ্ন করেছেন, উঠবেন না কি? এ আহ্বানবাণী সেদিন শুনেছিলেন বাংলার বিপ্লবী দল। তাঁরা বুঝেছিলেন জীবন

বিপন্ন করাই যথেষ্ট নয়। মায়ের পূজামণ্ডপে আত্মবলি দিয়ে, মায়ের জন্য জীবন দিয়েই সাধন করতে হবে ব্রত। তাহলেই আবার উঠে আসবেন কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা মা। এই কথাই সেদিন দেশের যুবসমাজকে জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, মাকে আনতে হলে আগে চাই মায়ের পূজামণ্ডপে আত্মদান। স্বামীজী বলেছিলেন, ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি তোমাদের নিকট মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন।

নবচেতনালব্ধ সক্রিয়, সতেজ, আত্মনির্ভরশীল জাতি স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ হল। নূতন ভাবধারা জাতির মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তরুণ ভারত নূতন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলে তিন শত বছরের পথ তিন দিনে অতিক্রম করতে চাইল। সেই দিনই হল নব ভারতের গোড়া পত্তন। স্বামীজী প্রাচ্যের ধর্মমত এবং প্রতীচ্যের সমাজকল্যাণ বোধকে এক করে উভয়ের সমন্বয়ে এই নব ভারতের জন্য সৃষ্টি করলেন নূতন ধর্ম "নরনারায়ণের সেবা"। জাতি হঠাৎ যেন উঠে বসল, বঙ্কিমের ভাষায়—মা উঠে এলেন।

এরই ফলে ভারতে এল বিপ্লবযুগ। বিপ্লবী ভারত স্বামীজীর এই নরনারায়ণের সেবাকেই তাদের ধর্ম বলে গ্রহণ করল। যাগযজ্ঞ পূজা উপাসনা ক্রমে ভুলে গেল তরুণ ভারত। ফলতঃ বিপ্লবী বিবেকানন্দের বিপ্লবী আহ্বানেই সেদিন সাড়া দিয়েছিল বিপ্লবী ভারত।

পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থানকালে স্বামীজী প্রচার করেছিলেন, ভারতের সর্বধর্মসমন্বয়ের মত। কিন্তু ভারতে ফিরে এসেই তিনি শোনালেন নবজাগরণের বাণী। আমেরিকায় বসেও তিনি ভারতকে ভোলেননি। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি বলেন, "ভারতের সবচেয়ে অভাব আজ ধর্ম নয়। ভারতের কোটি কোটি আর্ত নরনারী শুষ্ক কণ্ঠে দুটি অন্ন চাইছে। তারা চাইছে অন্ন আর তার বদলে পাচ্ছে প্রস্তরখণ্ড। সাধারণ ভারতবাসীর কথা এমন করে এর আগে কে বলেছে? কে প্রকাশ করেছে ভারতের অন্তরের বেদনা এমন করে? ইনিই বিপ্লবী বিবেকানন্দ।

ভারতে ফিরে আসার পরেই স্বামীজীর বক্তৃতায় ধ্বনিত হল এক নূতন স্বর। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে রামনাথপুরের বক্তৃতায় তিনি বলেন—"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। মহাদুঃখ অবসানপ্রায়। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব জাগরিত হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন।"

আমরা দেখি বঙ্কিমের কালস্রোতে নিমজ্জিত ভারতমাতাই উঠে আসছেন। কুম্ভকোনামে এই কথাই স্বামীজী আরও স্পষ্ট করে বললেন—

"তোমরা স্বদেশহিতৈষী হও, যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসো।"

কলকাতা আসার আগে স্বামীজীর শেষ বক্তৃতা ছিল—"ভারতের ভবিষ্যৎ"। এই বক্তৃতায় স্বদেশবাসীদের আহ্বান করে স্বামীজী বলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, একমাত্র এই দেবতাই জাগ্রত। সর্বত্র তাঁহার হস্ত; সর্বত্র তাঁহার কর্ণ; তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।"

মাদ্রাজের বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন—"তোমরা মানুষ হও। চরিত্র গঠন কর।"

স্বামীজীর এই বাণী বিপ্লবী ভারতের নিকট উপেক্ষিত হয় নি। স্বামীজীর নির্দেশেই বিপ্লবী ভারত মানুষ গড়ার ভার গ্রহণ করেছিল। দৃঢ়চরিত্র ভারতবাসী যারা সঙ্কল্পে দুর্জয়, তাদেরই অস্থি দিয়ে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী ভারত।

স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পৌছেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সম্বর্ধনা সভায় তিনি বাংলাদেশের যুবকবৃন্দকে আহ্বান করে বলেন—"কলকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠো, জাগো, শুভমুহূর্ত সমাগত। ওঠো, জাগো, তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করছেন। যুবকদের দ্বারাই এই কাজ সাধিত হবে।"

স্বামীজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার তরুণতাপসবৃন্দ গড়ে তুলল বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি; এগিয়ে এল দেশের জন্য আত্মবলি দিতে। সৃষ্টি করল মুরারিপুকুর, ঋষি অরবিন্দের বিপ্লব সাধনার পাদপীঠ। এই সাধনক্ষেত্রে পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে জন্ম লাভ করল নব বাংলা, নবীন ভারত। শত শত বৎসরের মেঘ এক মুহূর্তে কেটে গেল যেন, শত শত বৎসরের ক্লীবত্বকে পরিহার করে জ্বলে উঠল ভারতের বুকে বিপ্লবের আগুন, বাংলায় বিপ্লববাদের নৈমিষারণ্য এই মুরারিপুকুর।

রবীন্দ্রনাথ একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন—"পিতামহগণ আমাদের সব রকম সম্পদই দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু দেন নাই মৃত্যুর সম্পদ, দেন নাই মৃত্যুপথের পাথেয়। মরণের পথযাত্রীর গৌরব তাঁরা আমাদের দিয়ে যান নি।" কবি তখন জানতেন না শীঘ্রই আসছে মৃত্যুপথের অমর যাত্রীদল। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারতকে গৌরবান্বিত করবে যারা, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্ত্ব আনবে যারা ভারতের জন্য।

বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত স্পন্দিত হয়েছে অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী।

সে ইতিহাস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে দেশে এবং বিদেশে, বহু মানুষের জীবনে ও স্মৃতিতে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হল পলাশীর প্রান্তরে। ভারতের গৌরবরবি সেদিন ডুবে গেল পলাশীর গঙ্গায়। জয়ী হল ইংরেজের বীরত্ব নয়, জয়ী হল তার কূটনীতির হীন চাতুরী। এর ফলেই হঠাৎ একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। ইংরেজ সেদিন তার চাতুরী দিয়েই জয় করেছিল বাংলা দেশকে, এই চাতুরী দিয়ে এই শঠতা দিয়েই সে ভুলিয়েছিল বাংলার অর্থভাণ্ডার জগৎ শেঠকে। জগৎ শেঠের অর্থই সেদিন বাংলার সিংহাসন ভাঙত আর গড়ত।

ইংরেজের চাতুরী সেদিন জয়ী হলেও বাংলার বীরত্ব এই হীনতার নিকট মাথা নত করে নি। সাধারণ বাঙালী বাংলার প্রজাশক্তি সেই প্রথম দিন থেকেই ইংরেজকে বাধা দিয়ে আসছে। ১৭৫৯ সালের জুলাই মাসে মেজর ওয়াট্‌সন বর্ধমান থেকে গবর্ণর হলওয়েলের কাছে লিখছেন—"এখানকার ৫০০০ প্রজা বিদ্রোহ করেছে। এরা কোম্পানীর কোষাগার দখলের চেষ্টা করেছিল।" পর বৎসর ১৭৬০ সালে বীরভূমের জমিদার আলাদ জামান খান ইংরেজকে কর দিতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেন। বর্ধমানের রাজাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলিত শক্তি ইংরেজকে দমন করবার জন্য ১৭৬১ সালের জানুয়ারী মাসে মুর্শিদা-বাদের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেজর ওয়াটসন ও মেজর হোয়া-টারের নিকট তাঁরা পরাজিত হলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখছেন—"খাজনা আদায়ের ব্যাপারে মেদিনীপুরের জমিদারগণ আমাদের প্রবল বাধা দিচ্ছে। আমাদের শত্রুদের সঙ্গে মিলে তারা বিদ্রোহ সৃষ্টি করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সবাই এদের পক্ষে।" ১৭৬৫ খৃঃ-অব্দে নদীয়ার রাজা ইংরেজকে কর দিতে অস্বীকার করেন। কোম্পানী প্রস্তাব করে যে, রাজার জাতি নাশ করে কর আদায় করা হোক। ঐ বছরই ঘাট-শীলার রাজা এবং ঝাড়গ্রামের রাজা ইংরেজকে কর দেওয়া বন্ধ করলে তাঁদের দমন করবার জন্য লেফটেনাণ্ট ফার্গুসনকে পাঠানো হয়। তাঁরা ঘাটশীলায় ইংরেজ সৈন্যকে গেরিলা যুদ্ধে বিশেষ বিব্রত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৭৪ সালে রাজা জগন্নাথ ধলকে ঐ অঞ্চলের রাজা বলে স্বীকার করে সন্ধি করতে হয় ইংরেজকে। ১৭৭১ সালে মানভূমে চুয়াড়গণ বিদ্রোহ করে। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ চলে। ক্যাপ্‌টেন কার্টার, লেফ্‌টেনাণ্ট গণ, লেফটেনাণ্ট ইয়ং, মেজর ক্রফোর্ড সৈন্য দলের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করেন। ১৭৭৫ সালে ইংরেজের

চাতুরী জালের আর একটি চক্রান্ত প্রকাশ পেল। জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত করে বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস সেই সময়ে ইংলণ্ডীয় আইন প্রয়োগ করে ফাঁসি দিলেন মহারাজ নন্দকুমারকে। সেদিনের ভারতীয় আইনে জালিয়াতি অপরাধ প্রমাণিত হলেও তার জন্য ফাঁসির বিধান ছিল না। হেষ্টিংস ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাত করতে চেয়েছিলেন। নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট। নন্দকুমারই বৃটিশ ভারতের প্রথম বলি। বৃটিশ মনীষী মিঃ এডমাণ্ড বার্ক হেষ্টিংস সম্পর্কে বলেন, তিনি নন্দকুমারকে হত্যা করেছেন।

Ha miscreant! plunderer! murderer of Nond Coomar! Where wilt thou hide thy head now?

—Lausson's Warren Hastings

Mr. Justice Beverage has pointed out that execution of Nand Kumar was a judicial murder and the popular feeling was that he was a martyr.

—Walsh's History of Murshidabad P. 222

১৭৮২ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহ করল রংপুর। ১৮ই জানুয়ারী মিঃ হল্যাণ্ড কোম্পানীর নিকট লিখছেন—বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাগণ তেলা নামক স্থানে সমবেত হয়ে দীর্জে নারাণকে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রাজা বলে নির্বাচিত করেন। এর ৩ বছর পরে শ্রীহট্টের রাজা রাধারাম বিদ্রোহ করেন। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা ও প্রজারা একসঙ্গে বিদ্রোহ করেন। ১৭৯৯ খৃঃঅব্দে অযোধ্যার নবাব ওয়াজির আলি বিদ্রোহ করেন। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবগণ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বিদ্রোহে সাহায্য করার অপরাধে সারনাথের রাজা জগৎ সিংহ আন্দামানে নির্বাসিত হন এবং বারাণসীর রাজা শিব সিংহের ফাঁসি হয়। শিব সিংহ ইংরেজ-শাসিত ভারতের দ্বিতীয় বলি।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসারিত হতে থাকে। একটির পর একটি অঞ্চল বৃটিশের করতলগত হতে থাকে। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতে। ১৮০৮-১২ সালে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ হয়। ১৮১০-১১ সালে বারণসীতে করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ১৮১২-১৮ সালে উড়িষ্যায় পাইকগণ বিদ্রোহ করে। ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত আসামের খাসিয়ারা বিদ্রোহ করে। ১৮৩২ সালে মানভূমে বিদ্রোহ হয়। এছাড়া মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, সাঁওতাল

বিদ্রোহ প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। এই সময়ের বৈশিষ্ট্য হল, জমিদার ও প্রজাগণ ইংরেজ-বিরোধী কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ইংরেজের অনুগত। শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ভাবধারার ভাবুক। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থাই চলতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে দেশে চলছিল অরাজকতা। জমিদার শ্রেণী সম্রাট বা নবাবদের কর দেওয়া বন্ধ করে দিল। নিম্নশ্রেণীর প্রজারাও এই সময়ে কর দিত না। ফলে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ যখন বল প্রয়োগে কর আদায় আরম্ভ করে জমিদার ও সাধারণ প্রজার স্বার্থে আঘাত লাগল। তাঁরা স্বতঃই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সিপাহী বিদ্রোহ দেশে সামন্ত শ্রেণীর শেষ বিদ্রোহ। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত রাজাগণ এককভাবে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তাঁবা মিলিত ভাবে বিদ্রোহ করলেন। দেশকে ইংবেজ-কবল থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। বিহারেব কুমার সিং, পেশোয়া নানা সাহেব এবং তাঁর সহকর্মী আজিম উল্লা খাঁ, তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁন্সিব রাণী লক্ষ্মীবাঈ, শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুব শাহ—সবাই এ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বারাকপুরের ৩৪তম সৈন্য দলের মঙ্গল পাণ্ডেই প্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। এই অপবাধে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ ভারতে সামন্তপতিদেব ব্যাপক ও মিলিত অভ্যুত্থান। কিন্তু এ সত্বেও এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। তাব কারণ, তখনও ভারতে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হয় নি। অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনাব অভাবই এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। জানা যায়, ১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থানে প্রায় ২ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দিয়েছে। এদিকে স্বাজাত্য-বোধ এবং জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হচ্ছিল তরুণ মনে। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ভিতব দিয়েই আমরা জাতীয়তার প্রকাশ দেখি প্রথম। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত কবি ডিরোজিওর "ফকির অব জাঙ্গিরা"ই দেশপ্রেমমূলক প্রথম কবিতা।

My country ! in the days of glory hast
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory ? Where that reverence now ?

এই কবি ডিরোজিওই জন্মভূমি ভারতকে প্রথমে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। ঠিক এই সময়ে আরেকজন পথিকৃৎ রামমোহনের আবির্ভাব। ১৮২৭ সালে

"জুরী আইন" প্রণয়ন করা হল। এই আইনের বিধান ছিল যে খৃষ্টান জুরীর সাহায্যে হিন্দু মুসলমানের বিচার চলবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান জুরীর সাহায্যে খৃষ্টান অপরাধীর বিচার চলবে না। এমনকি এদেশী খৃষ্টানদেরও না। রামমোহন পার্লামেণ্টে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য মিঃ ক্রফোর্ড নামক এক পার্লামেণ্ট সদস্যের নিকট এক পত্র লিখেন। তিনি লিখলেন, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ বৈষম্য মেনে নেওয়া হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব। এ বৈষম্য যদি চলতে থাকে ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন দিন উপস্থিত হবে যেদিন ভারতবাসী এর বিরুদ্ধে লড়বে এবং লড়ে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্ল্যাণ্ড নয় যে, দু'চারখানা রণতরী পাঠিয়ে তাকে শায়েস্তা করা যাবে।"

১৮৩০ সাল থেকে অর্ধশত বৎসর ধরে যাঁরা ভারতীয় সমাজের নেতৃত্ব করে গিয়েছেন তাঁরা ছিলেন ডিরোজিও'র ছাত্র। এঁদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ডিরোজিওর নিকট থেকে এঁরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-হিতৈষণায় উদ্যোগী হন।

এদেশে রামমোহনই প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা থেকে প্রেরণা লাভ করেন। রামমোহনের মাধ্যমেই তরুণ বাংলা ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। রামমোহনের উদ্যোগেই প্রতি বৎসর গড়ের মাঠে 'বাস্তিল দিবস' উদ্‌যাপিত হত। এই অনুষ্ঠানে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হত। বহু পরিবর্তনের পর এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাই পরবর্তী কালে আমাদের জাতীয় পতাকায় পরিণত হয়েছে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের উপর দুঃসহ অত্যাচার চলে। এর ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর যুবকদের চোখ খুলে যায়। তাঁরা বুঝতে পারেন ইংরেজ আমাদের বন্ধু নয়, তারা ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। এ ছাড়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারত শাসনের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করায় শাসনভার নিয়ে যে সমস্ত ইংরেজ ভারতে আসতে লাগলেন, তাঁরাও এদেশীয় প্রজাদের সঙ্গে মিলনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না। সব দেশেই রাজনৈতিক চেতনা থেকে আসে জাতির আত্মচেতনা-বোধ। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখে-ছিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ইত্যাদি। এর পরে নবজাগরণের দীপ্ত ছটা নিয়ে একে একে এলেন মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিম, হেম, নবীন এবং আরও অনেকে। বাংলার বাণীমন্দির নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নূতন আলোকছটায় ঘুমন্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গ হল: বাংলার প্রতিভা নবীন প্রাণে মঞ্জুরিত হয়ে উঠল।

ক্রমে বাঙ্গালীর শিল্পসাহিত্য ব্যবসা বাণিজ্য রাজনীতি সব ক্ষেত্রে নূতন প্রাণের স্পন্দন এল। রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর অমর লেখনী নিয়ে। পাশ্চাত্যের টেমসকে তিনি প্রাচ্যের গঙ্গার সঙ্গে এক মহামিলনে মিলিত করলেন। এলেন অবনীন্দ্রনাথ, এলেন নন্দলাল তাঁদের তুলি নিয়ে। প্রতীচ্যের বিজ্ঞানও নূতন জীবন পেল আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্য দিয়ে। বাংলার সাহিত্যাঙ্গনেই প্রথম স্বাধীনতার ফুল ফুটল।

রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহের মধ্যেই। রঙ্গলাল লেখেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী কবি। বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজের জয়ই গেয়েছিলেন।

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়,
মুক্ত মুখে বল ভাই বৃটিশের জয়।

কিন্তু এর মাত্র ২ বৎসর পরেই গুপ্ত কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল আর এক নূতন সুর :

ভুজঙ্গ হিংস্রক কীট তারে কিবা ভয়?
মণিমন্ত্র মহৌষধে প্রতিকার হয়
মিশনারী রাঙানাগ দংশে ভাই যারে
একেবারে বিষ দাঁত সেরে ফেলে তারে।

হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত প্রকাশিত হল ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ৭ই শ্রাবণ। কবি গাইলেন—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়

কবি শুধু স্বাধীনতাই চান নাই, কী উপায়ে এই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে তাও বলেছেন—

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না খোল তরবার
এসব দৈত্য নহে তেমন।

নাট্যকার মনোমোহন বসুর কণ্ঠে শুনি—

দিনের দিন সবে দীন, ভারত পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ অনশনে তনু হয় ক্ষীণ।

এলাহাবাদ-প্রবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায় গাইলেন—

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে ?

এইভাবে বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তরুণ সমাজ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হল। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই তারা গড়ে তুলল "সঞ্জীবনী সভা", ভারতে প্রথম গুপ্ত সমিতি।

রবীন্দ্রনাথ তার "জীবন স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন, "জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীদের দল। কলিকাতার এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সভায় সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল। যে পোড়ো বাড়ীতে সভা বসিত তার অবস্থিতি ছিল ঠনঠনিয়ায়। বাড়ীর মালিক কে কেউ জানিত না।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি"তে এ সম্পর্কে আছে—"সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তার মধ্যে প্রধানই ছিল মন্ত্রগুপ্তি। এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। *** আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত। তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথা মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সভার প্রারম্ভে বেদ-মন্ত্র গীত হইত—'সংগচ্ছধ্বম্—সংবদধ্বম্'। ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে এক ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ এক অজ্ঞাত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।"

সভার কার্যবিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হত। ঐ ভাষায়ই সঞ্জীবনী সভার নাম ছিল—'হাঞ্চু পামু হাফ'। দেশ উদ্ধারের জন্য সঞ্জীবনী সভাই প্রথম গোপন সমিতি।

বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্রেও ১৮৭০ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ৩০ বৎসর বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালাবার বা সমিধ সংগ্রহের যুগ। রাণাড়ের নেতৃত্বে

সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ খৃঃ অব্দে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্করের নিবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। দেশকে স্বাধীন করার জন্য মারাঠা বীর শিবাজীর অনুকরণে পার্বত্য জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মারাঠা বীর যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ফাড়কের বিদ্রোহ চলেছিল। মারাঠা বীর যুবক স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তিনি নিজে লুকিয়ে থাকতেন এবং সুবিধা পেলেই দলবল নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন নি। ক্রমে তিনি হীনবল হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে ধরা পড়ে নির্বাসিত হন। ফাড়কে তাঁর নির্বাসনস্থান থেকেও পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয় নি। কিন্তু ফাড়কের প্রজ্বলিত আগুন সাময়িক ভাবে নিভে গেলেও মহারাষ্ট্রে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হল না। দেশপ্রেম এবং ইংরেজ-বিদ্বেষ অচিরেই সমগ্র মারাঠা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। যুবকদের ক্ষাত্র শক্তির প্রতি অনুরাগী করে তুলবার জন্য শরীরচর্চার প্রবর্তন হল এবং এই উদ্দেশ্যে সার্বজনিক গণপতি উৎসব আরম্ভ হল। দশ দিন ধরে উৎসব চলত। এই সময়ে যুবকদল রাজপথে ইংরেজ-বিরোধী গান গেয়ে বেড়াতেন। এর পরে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে শিবাজী উৎসব আরম্ভ হল। শিবাজীর মুকুট ধারণের দিনের স্মৃতি হিসাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মারাঠা দেশে এই সমস্ত আন্দোলনের নায়ক ছিলেন দামোদর হরি চাপেকার এবং তাঁর ভ্রাতা রামকৃষ্ণহরি চাপেকার। "হিন্দু ধর্মের প্রতিবন্ধক নাশক সমিতি" নামে এক সমিতি গঠন করে এঁরা যুবকদের গোপনে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সমিতিই পরে 'চাপেকার সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হয়।

ইতালীতে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত কারবোনারি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারই বিস্তৃত বিবরণ এই সময়ে এদেশে এসে পড়ে। ফলে তরুণ সমাজ নব্য ইতালীয় ছাঁচে দেশকে গড়ে তুলবার জন্য উদ্বুদ্ধ হল। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"আমরা অষ্ট্রীয়ার অধীন ইতালীয়ানদের অবস্থা ও বৃটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মফঃস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়রা কোনরূপ ন্যায় বিচারই পায় না। একই সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চা বাগানের

কুলীদের দুর্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়।' অমৃতবাজার পত্রিকা ম্যাজিষ্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করত। এই ব্যাপারে ম্যাটসিনি-পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেলল। আমরা ম্যাটসিনির লেখা ইতালীয় যুব আন্দোলনের ইতিহাস পড়া আরম্ভ করলাম। আমরা তখন ইতালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষভাবে কারবোনারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাটসিনি প্রথমে কারবোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ইতালীতে যে সমস্ত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কারবোনারি।"

এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজের প্রকোপে পড়ে সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছাত্র সমাজকে ইতালীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। প্রকাশ্য সভায় অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি বলতেন, "I am an avowed disciple of Matsini and Garibaldi." ইংরেজী ভাষা যারা জানে না, তারাও যাতে ইতালীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় জানতে পারে এজন্য তিনি যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণকে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবন কাহিনী বাংলা ভাষায় রচনা করতে বলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ে হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে সেই সময়ে ছাত্র সমাজে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীপ্রসাদ স্কুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় ভারত উদ্ধারে দীক্ষা গ্রহণের এক চাঞ্চল্যকর পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। অনুষ্ঠানের নিয়ম এই ছিল : গভীর রাত্রে দীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞাগুলি কাগজে লিখে বুকের রক্তে তাতে স্বাক্ষর করে অগ্নি প্রদক্ষিণ করতে করতে কাগজগুলিকে অগ্নিতে অর্পণ করতে হত। প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল—(১) আমরা স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। (২) দুঃখদুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও আমরা কখনও এই গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব স্বীকার করিব না। (৩) আমরা নিয়মিত অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করাইব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ভারত-ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। পরাধীন ভারতের পূর্ণ মুক্তির বীজ বপন ঘটেছিল এই সময়েই। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার ধর্ম মহাসভায় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠে সংঘটিত হল পরাজিত নিপীড়িত ভারত কর্তৃক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অজেয় পাশ্চাত্যের অন্তর বিজয়। অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর নিকট

অসীম শক্তিশালী পশ্চিম সেদিন নূতন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল। ভোগের উপর ত্যাগের দুন্দুভি বেজে উঠল। নিপীড়িত ভারত আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। নিপীড়িত ভারতবাসী আপনার মধ্যে অনুভব করল যুগযুগ-সঞ্চিত তার অপূর্ব তপঃশক্তি।

শিখ, মারাঠা, রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি রণনিপুণ জাতি থাকতে বাঙ্গালীর হাতে মারণাস্ত্র কেন গর্জে উঠল এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন,—"গত আশি বৎসর ধরে ভারতকে এই বাংলাই দিয়েছে প্রাণ, বাংলাই দিয়েছে জ্ঞান, বাংলাই দিয়েছে প্রেরণা। যখন সমস্ত ভারত পুরাতন মোহে ও অচলায়তনে আড়ষ্ট ছিল শৈবালাচ্ছন্ন মজা নদীর মত তখন এই কেরাণীর জাত বাঙালীই আকণ্ঠ ভরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উগ্র সুরা পান করেছিল। সে যুগে সে-ই হয়েছিল নীলকণ্ঠ শিব, নিজে বিষ পান করে দেশকে অমৃতের অধিকারী করেছিল। শিক্ষায় দীক্ষায় এত বড়, এমন মহৎ একটা জাতিকে ক্ষাত্রধর্মে বঞ্চিত রাখা শাসক শক্তির পক্ষে সমীচীন হয় নি। মানুষের প্রাণে আছে স্বাভাবিক তেজ, আছে মৃত্যুর সঙ্গে খেলার সাধ। বাঙালীজীবনে সেই স্বাভাবিক তেজ প্রকাশের বৈধ সহজ পথ না থাকায় সে সুড়ঙ্গ কেটে পাতালমুখী এই দুর্দৈব সৃষ্টি করেছিল। নিরস্ত্র রেখেও ভাবদীপ্ত বাঙালীকে স্বাধীনতার পথ থেকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত অগ্নিযুগে বাঙালীর হাতে বোমা, যার শেষ পর্ব রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র বসুর সমরায়োজন। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে তরুণ বাংলার নবীন স্বপ্ন হল—ভারতকে যে কোন উপায়ে স্বাধীন করতেই হবে।"

প্রথম অধ্যায়

১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানে শিকাগো ধর্মসভার অনুরূপ এক সভার আয়োজন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমন্ত্রিত হলেন সেই সভায়। স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য এলেন জাপানী চিত্রশিল্পী কাকাসু ওকাকুরা। ওকাকুরা ভারতে এলেন ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু স্বামীজী তখন অসুস্থ। জাপানে ধর্মসভায় তাঁর পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হল না। বাংলার সে যুগের সংস্কৃতিকেন্দ্র ঠাকুর বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে ওকাকুরার সম্বর্ধনার এক আয়োজন করা হয়। সমস্ত ব্যবস্থার ভার পড়ল তরুণ ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র এবং তেঘরিয়ার শশিভূষণ রায়চৌধুরীর উপর।

সম্বর্ধনা সভায় ওকাকুরা বলেন, "এশিয়া মহাখণ্ডের কৃষ্টি এক। সমগ্র এশিয়া থেকে পাশ্চাত্ত্য আধিপত্য বিদূরিত করবার জন্য চীন, জাপান প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ভারতকে স্বাধীন করে এর মধ্যে আনতে হবে।" ভারতের মহান ঐতিহ্য সত্বেও ভারত আজ পরাধীন কেন? পরাধীনতা নীরবে মেনে নেওয়ার জন্য তিনি এদেশের লোকদের মৃদু ভৎর্সনা করেন। এ ভৎর্সনা আর কাউকে বিচলিত না করলেও প্রমথনাথকে আঘাত করে। সভার শেষে তিনি ওকাকুরার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

জেনারেল এসেম্বলী কলেজের ছাত্র শ্রীসতীশচন্দ্র বসু কলেজেই ব্যায়াম চর্চা করতেন। স্বামীজীর নির্দেশে ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনার জন্য তিনি কলেজ ভবনেই Historical Club নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়বার আয়োজন করেন, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের কোন গৃহ ছাত্রদের ব্যবহার করতে দিলেন না। ফলে আমগাছতলায়ই আলোচনাচক্র বসে। লাঠি খেলার আবেদন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করলেন না। তখন সতীশচন্দ্রের উদ্যোগে মদন মিত্র লেনে ছাত্রগণ একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ব্যায়াম চর্চা, লাঠি খেলা এবং অন্যান্য আলোচনারও ব্যবস্থা ছিল। ক্লাবের একজন প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন। তেঘরিয়ার শশিভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় সতীশচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যারিষ্টার আশু চৌধুরীর নিকট নিয়ে যান। আশুবাবুর পরামর্শে এবং তাঁর চিঠি নিয়ে শশিভূষণ ও তাঁর সাথীরা ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রস্তাব শুনে প্রমথনাথ উত্তেজিত হয়ে সতীশচন্দ্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ওকাকুরার সম্বর্ধনা সভা থেকে

ফিরে যে সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি এতদিনে সে সুযোগ জুটে গেল। প্রমথনাথ স্বীকৃত হলেন। ১৯০২ সালের ১০ মার্চ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩০৮ শকাব্দ, দোলপূর্ণিমার দিনে প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন সমিতি। বিভিন্ন নাম আলোচনার পরে "অনুশীলন সমিতি" নাম দিলেন নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য থেকে নামটি আহরণ করেছিলেন। শুধু ব্যায়াম চর্চা এবং লাঠি খেলা নয়, বঙ্কিমের আদর্শে সর্বপ্রকার বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে হবে—এই ছিল সমিতির আদর্শ। প্রমথনাথ ও অন্যান্য সকলেই নামটি অনুমোদন করলেন। সমিতির সভাপতি হলেন প্রমথনাথ; সহ-সভাপতি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক সতীশচন্দ্র বসু। বৈপ্লবিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি National Council গঠিত হল। কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হল।

প্রথম যুগে সমিতি গঠনে ভগিনী নিবেদিতার দান অসামান্য। প্রায় প্রত্যহই এসে তিনি সমিতির কর্মীদের উৎসাহ দিতেন। এদেশে আসার আগে তিনি ছিলেন আইরীশ বিদ্রোহী দলের কর্মী এবং প্রিন্স ক্রোপটকিনের শিষ্যা। ভারতে এসে তিনি তরুণ সমাজে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা পরাধীনতামুক্ত করে ভারতকে আবার মহাভারত গড়ে তুলতে হবে, এই ছিল তাঁর সংকল্প। সমিতির প্রচারক দল গঠন করবার জন্য তিনি নিজের দুই শতাধিক পুস্তক সমিতিকে দান করেন। অনুশীলন সমিতির ব্যায়ামশালায় লাঠি খেলা, অসি খেলা, কুস্তী, মুষ্টি যুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। রামায়ণ নামে এক প্রকার কথকতা সদস্যদের মধ্যে গোপনে অনুষ্ঠিত হত। সমিতির সদস্যদের একটি প্রিয় গান—

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়াচরণে নম্র শির।
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর।
আবাহন মার যুদ্ধ কারণে,
তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে,
পশুবল আর অসুর নিধনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্র ধীর।
মায়ের আরতি অরাতি নাশন,

পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ
শত্রুরক্তে মায়ের তর্পণ
জবার বদলে ছিন্ন শির ॥

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ ভাবমূর্তি জন্ম নিল বিদেশী পরিবেশে। বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা এবং 'পুরো সাহেব' কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১৫ আগষ্ট। খাঁটি সাহেবী পরিবেশে লালিতপালিত শিশুর ৫ বৎসর বয়সেই শিক্ষা আরম্ভ হয় দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুলে, ৭ বছর বয়সে অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহ অরবিন্দ ইংলণ্ডে চলে যান এবং ১৪ বছর সেখানে শিক্ষালাভ করেন গ্রামার স্কুল অব মাঞ্চেষ্টারে। তারপরে লণ্ডনে সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালে এবং কেম্ব্রিজ কিংস কলেজে। কিন্তু আই-সি-এস পরীক্ষা পাশ করে অরবিন্দ যখন ২১ বছর বয়সে দেশে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আদৌ প্রভাবিত করতে পারে নি; তার চেয়ে বেশী শিখিয়েছে উগ্র স্বাধীনতার কামনা এবং বন্ধন-অসহিষ্ণুতা। এই অসাধারণ প্রতিভা মুক্তির প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর স্বভাব থেকেই বাল্যাবধি ভগবানের দান হিসাবে। ১৯০৬ সালে স্ত্রী মৃণালিনীকে এই কথাই তিনি লিখেছিলেন—"প্রিয়তমা মৃণালিনী, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। ১৪ বছরে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ১৮ বৎসরে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন কেম্ব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী। ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের উগ্র রাজনৈতিক সভা 'মজলিস'-এ দুজনেই ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ এ সম্পর্কে বলেন, "Indian Society সেই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। বোমা প্রভৃতির কল্পনাও এই সময় হইতে আইসে।" অরবিন্দ জীবনীকার গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন,—"কেম্ব্রিজে একটি সমিতি ছিল—Lotus and Dragon Society. সশস্ত্র উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্যই এই সমিতি। এখানেই দেশবন্ধুর সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাও অরবিন্দকে প্রভাবিত করেছিল।" ফরাসী বিপ্লবের শতাধিক বৎসর পরেও বিশ্বের তরুণ সমাজের নিকট সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ছিল আদর্শ। সুতরাং এ বাণী অরবিন্দকে যে আকৃষ্ট করবে তা বিচিত্র নয়। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ দেশে ফিরে আসেন বরোদার মহারাজের চাকুরি নিয়ে। দেশে ফিরেই ১৮৯৩ সালের ৭ আগষ্ট থেকে পরবর্তী সালের ৮ মার্চ পর্যন্ত বোম্বাইতে "ইন্দুপ্রকাশ"

পত্রিকায় একাদিক্রমে তিনি ১১টি প্রবন্ধ লিখলেন। ৩০ অক্টোবর ৪র্থ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "ফরাসী জাতি প্রকাশ্য ও সশস্ত্র বিদ্রোহে অগ্নিশুদ্ধ এবং রক্তস্নাত হয়ে পবিত্র হয়ে চার বৎসরের মধ্যে ১৩ শতাব্দীর অত্যাচারের কালিমা মুছে ফেলেছিল। ভারতবাসীকেও তা-ই করতে হবে।" ৪ ডিসেম্বর বঙ্কিম সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অরবিন্দ বাঙালী জাতি সম্পর্কে লিখলেন :—

"A people spirited, bold, ingenuous and imaginative, high among most intellectual races of the world and if it can get perseverance and physical elasticity one day to be high among the strongest. In politics he has always led and still leads for what Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week."

১৯১৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলক সম্পর্কে বলতে গিয়ে অরবিন্দ এই কথাই বলেছিলেন,—"The Indian people with the possible exception of emotional and idealistic Bengal have nothing or very little of the revolutionary temper."

'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ প্রথম লিখলেন,—"আমরা চাই বৃটিশ শাসন-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীন ভারত"। এর আগে এমন কথা কেউ বলেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বাধীনতার আদর্শ রূপ নিতে থাকে গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসবকে কেন্দ্র করে। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। সর্বোপরি নেতা ছিলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি ছিলেন মধ্য প্রদেশের কোন এক করদ রাজ্যের রাজা। রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি জাপানে গিয়ে ঐ যুদ্ধে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি আর ফেরেন নি। দলীয় সদস্যদের ধারণা ঐ যুদ্ধে তিনি আত্মদান করেছেন। সম্ভবতঃ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় অরবিন্দের প্রবন্ধগুলির প্রতি এই দলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং অরবিন্দের সঙ্গে তাঁরা সংযোগ রক্ষা করেন। আরও পরে বাংলাদেশে যখন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অরবিন্দ ঐ সমিতিতে যোগ দেন, তাঁকে যথারীতি দীক্ষা দিয়ে ঠাকুর সাহেবের দলের গুজরাট শাখার সভাপতি করা হয়।

বাঙালীর সৈন্যদলে প্রবেশাধিকার নাই—এ ক্ষোভ তরুণ বাঙালী মাত্রেরই ছিল। পি. মিত্র বিলেতে অবস্থানকালে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য চেষ্টা করেন। চারু দত্ত আই সি এসও বিদেশে থাকাকালে যুদ্ধবিদ্যা শিখবার জন্য উদ্যোগী

হয়েছিলেন। সামরিক শিক্ষালাভের জন্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও গৃহত্যাগ করেছিলেন। বর্ধমানের চান্না গ্রামের তরুণ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে এলাহাবাদে গিয়ে এই উদ্দেশ্যেই কায়স্থ পাঠ-শালায় ভর্তি হলেন হিন্দী শিখে হিন্দী নামে সৈন্যদল ভর্তি হবেন বলে। কায়স্থ পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। যতীন্দ্রনাথ রামানন্দ বাবুর পুত্রদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। রামানন্দ বাবুর স্ত্রীকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করতেন। দেহাতী হিন্দী শিখে যতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের নিকটবর্তী আড়াইয়া গ্রামের উপাধ্যায় পরিবারভুক্ত বলে বরোদায় গিয়ে মহারাজার সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে এই পরিবারেরই আর এক ব্যক্তি বরোদায় সৈন্যদলে ভর্তি হতে গেলে যতীন্দ্রনাথ ধরা পড়ে যান। এই সময়ে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দেন এবং অরবিন্দের বন্ধু খাসিরাও যাদব, লেফ-টেন্যাণ্ট মাধব রাও প্রভৃতির চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ বিনা শাস্তিতে রেহাই পান। অরবিন্দই যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবী দলে আকৃষ্ট করেন। এই ভাবে অরবিন্দ এবং যতীন্দ্রনাথের আদর্শ, মত, পথ ও সাধন এক হল।

১৯০২ সালের ২০অক্টোবর গায়কোয়াড়ের আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা বরোদা যান। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে ছিলেন গায়কোয়াড় কলেজের অধ্যক্ষ। মহারাজা সয়াজী রাও তাঁকে পাঠালেন ষ্টেশন থেকে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করে আনতে। নিবেদিতার Kali, the Mother বই এর কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানির প্রতি অরবিন্দের দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট হয়। পথিমধ্যে ঘোড়ার গাড়িতে উভয়ের মধ্যে এই নিয়েই আলোচনা আরম্ভ হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার কথাও ওঠে। নিবেদিতা অরবিন্দকে বাংলায় এসে বিপ্লব আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন। পরে মহারাজা সয়াজী রাও-এর সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁকে বিপ্লবান্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্য বিপ্লব সংগঠনে রাজন্যবর্গ, বিশেষভাবে সয়াজী রাও-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের কথা হয় যে, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য সংগঠন যাতে এক সঙ্গে চলে তারই চেষ্টা করা হবে। এরই ফলে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। তিনি সরলা দেবীর নিকট পত্র দিয়ে যতীন্দ্রনাথকে পি. মিত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। যতীন্দ্রনাথ পি. মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুশীলন সমিতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্থির হয়, যেহেতু যতীন্দ্রনাথ সৈন্যদলে ছিলেন, সুতরাং সমিতির সদস্যদের তিনিই

সামরিক শিক্ষা দিবেন। এই সম্পর্কে অনুশীলন সমিতির শ্রীসতীশচন্দ্র বসু বলেন,—"অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক মিত্তির সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, বরোদা থেকে একটা দল এসেছে। তাদের ও তোমাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন; সর্বপ্রকার সামরিক শিক্ষা তারাই দিবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের এক হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা সম্মত হলাম। উভয় দল এক হয়ে গেল। অরবিন্দ সমিতির আর একজন সহ-সভাপতি হলেন। এই সময়ে আরও দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যজন ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক)। সদস্যদের ঘোড়ায় চড়া শিখবার জন্য হালদার মহাশয় একটি ঘোড়া কিনে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ এসে যোগ দিবার পরে সমিতির কর্মকেন্দ্র ও ব্যায়ামাগার ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হল। অল্পবয়স্ক বালকেরা মদন মিত্র লেনে ব্যায়াম করত।"

যতীন্দ্রনাথ যখন অরবিন্দের নির্দেশ নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের জন্য বাংলায় চলে এলেন তার অব্যবহিত পরেই বারীন্দ্রকুমার বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হন।

পাটনা কলেজের সামনে বারীন্দ্রকুমারের একটি চায়ের দোকান ছিল। অর্থাভাবে চায়ের দোকানখানি অচল হয়ে পড়ে। কিছু অর্থের জন্য বারীন্দ্রকুমার সেজদা অরবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। অরবিন্দ তখন সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনায় আবিষ্ট। তিনি বারীন্দ্রকুমারকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় এসেছিলেন ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে। বারীন্দ্রকুমার আসেন ১৯০৩ সালের মাঝামাঝি। বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন,—"বাংলায় বিপ্লববাদ সংক্রামিত করার জন্য যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তার ৬ মাস পরে অরবিন্দ নিজে আমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দীক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান। তার মর্ম হচ্ছে—দেহে যতদিন জীবন আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতাশৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটছে ততদিন এই বিপ্লবব্রত পালন করে যাব। যদি কখনও এই গুপ্ত সমিতির কোন কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি, তাহলে চক্রের গুপ্ত ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে।" (অগ্নিযুগ ৩৯ পৃঃ)

অনেকের ধারণা বাংলাদেশে বিপ্লবের আগুন বোম্বাই অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—"বাংলায় গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লব প্রচেষ্টার গোড়াপত্তন হয় ১৯০২ সালে। কিন্তু তার পাঁচ বৎসর আগে হিন্দু-

মুসলমান দাঙ্গাকে অছিলা করে পুনায় প্রথম বিপ্লবস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। রাজ-রোষের উৎপীড়নের চাপে সে আগুন চাপেকার ভাইদের ফাঁসিতে ও তিলকের কারাবাসে সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমি যখন সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের সুযোগ নিয়ে দাক্ষিণাত্য ও পঞ্চনদের কর্তাদের নেড়েচেড়ে দেখলাম বুঝলাম তখন সে অগ্নি নির্বাপিতপ্রায়। বাংলাকেই সে আগুন নূতন করে জ্বালাতে হয়েছিল।" অগ্নিযুগ ৪৪ পৃঃ) আসলে মায়ের বোধন আগেই আরম্ভ হয়েছিল, যতীন্দ্রনাথ এসে একে সঞ্জীবিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন।

বারীন্দ্রকুমার বঙ্গদেশে এসে বিপ্লবকেন্দ্র ১০৮নং সার্কুলার রোডেই দেখেন। তখন সেখানে সস্ত্রীক যতীন্দ্রনাথ বাস করছেন এবং দিনের বেলায় ব্যায়াম ও লাঠি খেলা প্রভৃতি চলছে। সমিতির চলার রসদ আড়াইশখানেক টাকা আসছে ভবানীপুর ও বালিগঞ্জের অভিজাত মহল থেকে। প্রেসিডেন্ট পি. মিত্র দিতেন মাসিক ৩০ টাকা। অন্যান্য কয়েকজন উকিল-ব্যারিষ্টার দিতেন ১০ টাকা করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুরেন হালদার, রজত রায় প্রভৃতি জুনিয়রেরা দিতেন মাসিক ৫ টাকা করে। তরুণদের মধ্যে অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, জ্যোতিষ সমাজপতি, নলিন মিত্র, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি আগেই এসে জুটেছেন। আত্মোন্নতি সমিতির ইন্দ্রনাথ নন্দীরও যাতায়াত ছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করকে বারীন্দ্রকুমারই পি. মিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মেদিনীপুরে বিপ্লবকেন্দ্রও আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সদস্যদের অশ্বারোহণ শেখাতেন সতীশচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন পাকা ঘোড়-সওয়ার। সমিতির পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা তখন প্রায় চার হাজার। প্রধানতঃ সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক। এই সকল বিষয়ে ক্লাসও হত। প্রতি রবিবার আধ্যাত্মিক ক্লাস নিতেন সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং স্বামী সারদানন্দ। স্বদেশ-বন্দনা এবং ধর্মসঙ্গীত গীত হত। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথও এসে সমিতির সদস্যদের উৎসাহ দিতেন। অনুশীলন সমিতিতে এসে কবি "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে,' 'আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' প্রভৃতি গান গেয়ে শোনাতেন। রাজনৈতিক ও দেশপ্রেমোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করে এবং এই সমস্ত ক্লাসের মধ্য দিয়ে কর্মিদল গড়ে উঠবে এবং ভারতের নব জাগরণের এই চারণদল নগরে নগরে, গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবের বীজ বপন করবে এবং এই ভাবেই দেশে অসংখ্য বিপ্লব-কেন্দ্র গড়ে উঠে দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করবে, এই ছিল পরিকল্পনা। জাতির

মনকে গড়ে তোলা এবং জাতিকে নব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য এজন্য সে যুগের বিপ্লব আন্দোলনে শক্রনিধনের চেয়ে আত্মবলিদানের প্রেরণাই ছিল বেশী। মৃত্যু বরণের মধ্যেই আছে দেশজননীর বন্ধন মোচনের পথ—এই কথাই কর্মিদল জানতেন। হিংসা মূল লক্ষ্য ছিল না। বরং মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা সমিতির মূল মন্ত্র ছিল। মুক্ত ভারতই বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। এই ধারণাই ছিল কর্মীদের নিকট মূল প্রেরণা। সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই দেশের মুক্তি সম্ভব, তাই বিপ্লবীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। অন্য কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব বিপ্লবীদের ছিল না।

কর্মিদল এই ভাবে তৈরী হতে লাগল। বারীন্দ্রকুমার বলেন,—"১০৮নং সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে পলিটিক্যাল মিশনারী গঠনের ক্লাস বা পাঠচক্র পুরা দমে চলতে লাগল। বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মশাই সেখানে পড়াতেন ইতিহাস, বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের, শিখ অভ্যুত্থানের এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। তিনি সার্কুলার রোডের চক্রে বড় একটা আসতেন না, আমরা তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গিয়ে আলোচনা শুনতাম এবং মাঠে লাঠি খেলতাম। সখারাম বাবু নিতেন বৃটিশ ভারতের আর্থিক শোষণের ইতিহাসের পড়া। তাঁর এই লেকচারগুলি পরিবর্তিত আকারে 'দেশের কথা' নামে ছাপা হয়েছিল।" (অগ্নিযুগ ৭২ পৃঃ)

বারীন্দ্রকুমার বলেন,—"যতীনদা পড়াতেন রণনীতি, আর ক্লাসের ছাত্রদের কাছে উচ্ছ্বাসভরা অগ্নিদীপ্ত ভাষায় বলতেন ভাবী বিপ্লবের কথা। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে নানাজাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত, ইটালীর নব জাগরণ কাহিনী, মার্কিনের স্বাধীনতা সময়ের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন, ডাচ রিপাব্লিক নামক প্রজাতন্ত্রের রোমান্টিক জন্মকথা প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বই আমাদের পড়াতেন। এইসব 'রক্তগরমকরা কাহিনী পড়ে মত্ত ও রুদ্ধ রণ-অশ্বের মত আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম।" (অগ্নিযুগ ৭৩ পৃঃ)

এইভাবে বাংলাদেশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। কিন্তু অচিরেই এর অগ্রগতিতে ছেদ পড়ল। বারীন্দ্রকুমার যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন।

অরবিন্দ হস্তক্ষেপ করে বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে বারীন্দ্রকে সঙ্গে করে বরোদায় নিয়ে যান। প্রায় এক বছর পরে ভবানী মন্দিরের কপি সঙ্গে দিয়ে তিনি আবার তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন।

তিনি 'ভবানী মন্দির' ও 'No Compromise' নামে ২ খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার

পাণ্ডুলিপি সঙ্গে দিয়ে বারীন্দ্রকে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ভবানী মন্দির সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, কোন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গভীর অরণ্যমধ্যে ভবানী মাতার মন্দির গড়ে শিবাজী-আরাধ্যা ভবানী মাতার পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে খড়্গহস্তা ভবানী মায়ের চরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমর্পিতপ্রাণ কর্মী ও যোদ্ধ-দল গড়ে উঠবে। আর 'No Compromise' পুস্তকাটিও ছেপে আগামী কংগ্রেসে প্রচার করতে হবে। ভবানী মন্দির সম্পর্কে রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তার অংশবিশেষ :

"The central idea as to a given religious order is taken from the wellknown novel Anandamath of Bankim Chandra. We find the glorification of Kali under the name of Shakthi or Bhabani, (two of her numerous names) and preaching of gospel of force and strength is the necessary condition for political freedom. The necessity for Indians to worship Shakthi or Bhabani, manifested as the mother of strength is insisted upon if success is desired. A new order of political devotees was to be instituted. A new organisation of political sanyasis was to be started who were to prepare the way for revolutionary work. It was the liberation of India from foreign yoke. At this stage there was no reference to violence or crime". The reports of Rowlatt Committee (Page 67)

বারীন্দ্রকুমার খুলনার সুধীর সরকারের সাহায্যে গুপ্ত প্রেসের কালীতলা প্রেসে কয়েকদিন ধরে শেষ রাত্রিতে দরজা বন্ধ করে 'ভবানী মন্দির' ছাপলেন। বইয়ের আরম্ভটি ছিল এই রকম :

"Far from the contamination of modern cities and as yet little trodden by man, in a high pure air steeped in calm energy."

অর্থাৎ আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে দূরে, মানুষের বসতির বাইরে এক তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে এই ভবানী মন্দির নির্মিত হবে। ভবানী মাতার সাধক দল হবেন দেশভক্ত উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীর সন্তান। ভবানী মন্দির ছিল ১৬ পাতার চটি বই।

বারীন্দ্রকুমার এসেই দেবব্রতকে খুঁজে নিলেন। তার পরে ক্রমে এসে জুটলেন সুধীর সরকার, হরিশ ঘোষ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নূতন কেন্দ্র

হল দেবব্রতের বাড়ার কাছে গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের মোড়ে। প্রথমেই বারীন্দ্রকুমার ও হরিশ ঘোষ গিয়ে বিহারের কাইমুর পাহাড়ের উপর ভবানী মন্দিরের স্থান নির্দিষ্ট করে এলেন। এই স্থান হল ডেরী অন শোনের নিকটে কৌয়াখের ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে। এর পরে মেদিনীপুর, রংপুর, বাঁকুড়া, কটক প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি আবার নূতন প্রেরণায় গড়ে তোলা হল। কিন্তু সুরুতেই দেখা দিল ভাঙ্গনের পালা। এবারেও ভাঙ্গনের মূলে বারীন্দ্রকুমার। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে পি. মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে আমাদের অরুচি ধরে এল। আমি ও দেবব্রত দেখলাম এ পন্থায় দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবে না। দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্মকথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু'দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে জনে যে ভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছিল, সে উপায়েও দ্রুত দেশের মন বিপ্লবতন্ত্রের অনুকূল করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নূতন পন্থা, নূতন ভাব, নূতন মন্ত্রের চাই উপযোগী বাহন বাণীপত্র। 'সন্ধ্যা'র সামাজিক ফৈরঙ্গী বিদ্বেষ বুলি শুনতে শুনতে আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, আমাদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু এবং মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর মধ্যে পরামর্শ করে স্থির হল যে 'যুগান্তর' নাম দিয়ে খাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বার করতে হবে।"

বারীন্দ্রকুমার আরও লিখেছেন,—"কাগজ তো বার হবে কিন্তু তার পাথেয় সম্বল কই? আমাদের সঙ্গে পি. মিত্র মশাই-এর মতান্তর আরম্ভ হয়ে সুস্পষ্ট রূপ নিচ্ছে তখন। 'যুগান্তর' বলে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ বার করার প্রস্তাব শুনে পি. মিত্র মশাই ঘোর আপত্তি তুললেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—এসব অন্তঃসলিলা ধারায় করতে হয়।"

তরুণ দলের উদ্যোগে 'যুগান্তর' প্রকাশের আয়োজন চলতে লাগল। মাসিক ৩২ টাকা ভাড়ায় একটা ঘর নেওয়া হল ২৭নং কানাই ধর লেনে। প্রথম সংখ্যা যুগান্তর বার করবার জন্য ৫০ টাকা মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী দিলেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর বিভিন্ন কেন্দ্রে কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং সঙ্গে অর্থের জন্য আবেদনও গেল। বিপ্লবী সমিতির নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক শাখা সমিতিকেই আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রকে দেওয়ার কথা। কিন্তু এতদিন এ নিয়ম কার্যে পরিণত করা হয়নি। কলকাতা থেকে যে আড়াইশ টাকা চাঁদা পাওয়া যেত তাতেই সমিতির ব্যয় নির্বাহ হত। এছাড়া কাঁথীর দিগম্বর নন্দ বার্ষিক এক হাজার টাকা দিতেন। কিন্তু এবারে যুগান্তর পাঠানোতে সুফল ফললো। অপ্রত্যাশিতভাবে পাঁচশত টাকা এল রংপুর থেকে।

বারীন্দ্রকুমারের লেখা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তরুণ দল 'সন্ধ্যা' থেকেই পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করেছিলেন যুগান্তর প্রকাশের ৬ মাসাধিক কাল আগে, ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে। যুগান্তর প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। স্বদেশী যুগে রিসলী সাহেব এক সার্কুলার জারী করে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এর উত্তরে 'সন্ধ্যা' লিখল—

ফুলার করল নিয়মজারী,
মা বলে যে ডাকবে তার
শাস্তি হবে ভারী

সন্ধ্যার দুটি লেখার জন্য ব্রহ্মবান্ধবকে অভিযুক্ত করা হয়। লেখা দুটির শিরোনামা ছিল—

(১) 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' এবং (২)
ফিরিংগী পরম দয়ালু,
ফিরিংগীর কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাক আলু।

কিংসফোর্ডের আদালতে 'বন্দেমাতরম্' মামলার বিচারের সময়ে জনৈক সার্জেন্টকে প্রহারের অভিযোগে সুশীল সেনকে ঐ স্থানেই বিচার করে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করে ১৬ ঘা বেত্রাঘাত করা হয়। এই উপলক্ষে 'সন্ধ্যা' লিখল—

মাই নেম ইজ কিংফর্ড,
আই অ্যাম এ গ্রেট মদ
পেটের জ্বালায় আই কেম হিয়ার
ইন্ দিজ গ্রেট এম্পায়ার
মাই গুড লাক এণ্ড ফেথ
করে দিয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেট
আই রিটালিয়েটেড অন হিম সাধ মিটাইয়া
উইথ সিক্সটিন ষ্ট্রাইপস হাজতে পুরিয়া।

কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় প্রকাশিত বলে উপাধ্যায় নাম দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যা'। 'যুগান্তর' এই পত্রিকাকে অনুসরণ করে প্রকাশিত হলেও এর ভাষা আরও মার্জিত ছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'যুগান্তর' বিপ্লবমন্ত্র প্রচার করতে আরম্ভ করে। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করাই ছিল যুগান্তরের কাজ। ১৯০৭ সালের ১১ এপ্রিল সংখ্যা যুগান্তরে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "এসো অরাজকতা।" প্রবন্ধে ছিল—"অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান

করি—ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।" এই প্রবন্ধেরই অংশ বিশেষ—"ইংরেজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার করতে পারলে কাজ আমাদের এগিয়ে যাবে। তা'হলে শাসক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে বিপ্লবীরা বিদ্রোহীদলে শুধু যে এই সৈন্যদের পাবে তা নয়, শাসক-প্রদত্ত তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।"

প্রায় প্রতিসংখ্যা যুগান্তরেই এক রকম চিঠি বেরোত—নাম "যোগাক্ষ্যাপার চিঠি"। ১৯০৬ সালের ২৬শে আগষ্টের চিঠিতে ছিল—"অতি সহজেই দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরক তৈরী করা যায়।" ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্ট সংখ্যায় ছিল—"আর এক উত্তম উপায়ে দেশে বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুষীয় বিপ্লবে দেখা গেছে—রুষ সম্রাট জারের সৈন্যদলে বহু বিপ্লব-অনুরাগী লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই সব সৈন্য বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও এই নীতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশী হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা। কারণ বিদেশী শাসককে দেশবাসীর মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়।"

একখানি চিঠিতে ছিল—"সম্পাদক মহাশয়! আমি পাগল অধাতস্থ এবং হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপচে ভরে ওঠে যখন দেখি চারদিকে অরাজকতা নামছে। তখন আর অন্ধ মূক হয়ে থাকতে পারিনে। চারদিক থেকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি—যেন ভাবী গেরিলা যোদ্ধার দল অর্থ লুণ্ঠনে লেগে গেছে। হে লুণ্ঠন! আজ তুমি আমাদের সহায় হও। একদিন তুমি পুষ্পে কীটের মত গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় করে আনছিলে। হে লুণ্ঠন! আমি তোমায় পূজা করি। এখন এসো, সর্বত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্রবীর্য্য মানুষের বুকে। তুমি সে দিন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে স্মরণ করবে, পূজা করবে সেইদিন আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমায় পূজা করি।"

যুগান্তরের এই সমস্ত লেখার প্রভাব 'সন্ধ্যা'র উপর পড়তে বিলম্ব হল না। 'সন্ধ্যা'ও লিখতে লাগল—"আমরা চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি আধিপত্যের লেশ মাত্র থাকতে দেশের কোন উন্নতির আশা নেই।"

যুগান্তরে খোলাখুলি ভাবেই বলা হত—"শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্য পেশীবহুল সবলদেহ প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য চাই অস্ত্র এবং তা বিদেশ থেকে নানা কৌশলে আমদানী করতে হবে। এ দেশে গোপনে কিছু অস্ত্র নির্মাণ

করা প্রয়োজন। বিদেশে গিয়ে বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী শিখে আসতে হবে।" আলিপুর মোকদ্দমার রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্স্ বলেন—"যুগান্তরের প্রতিছত্রে থাকত ইংরেজ-বিদ্বেষ, প্রতিলাইনে থাকত বিপ্লবের উত্তেজনা, কি করে বিপ্লব রূপায়িত হবে যুগান্তরে থাকত তারই ইঙ্গিত।"

যুগান্তর প্রকাশের কিছু আগে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ কার্যে পরিণত হল। পূর্ববঙ্গের লাট হয়ে বসলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের লাট হলেন স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। পূর্ববঙ্গে ফুলারী আদেশে বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ। সর্বোপরি বরিশাল সম্মেলনে দক্ষযজ্ঞ নাশের পর ফুলারের মাথার উপরই প্রথম বিপ্লবী বাংলার দৃষ্টি পড়ল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে বৈপ্লবিক গুপ্তচক্রের এক বৈঠক বসল। রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ এবং চারু দত্ত আই সি এস—তিনজনে মিলে স্থির করলেন ফুলার সাহেবই হবেন বিপ্লবী বাংলার প্রথম বলি।

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্স পুলিশের লাঠির ঘায়ে পণ্ড হল। এখানে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নেতারা লাঞ্ছিত হলেন। অরবিন্দ ঐ সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল থেকে উত্তেজনার আগুন নিয়ে অরবিন্দ যখন কলকাতা ফিরে এলেন যুগান্তর তখন এক মাসের শিশু। এর আগে মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। যুগান্তরের তখনও জন্ম হয় নি। সম্মেলনের অধিবেশনে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে 'সোনার বাংলা' এবং 'No Compromise' প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন। সত্যেন বসুর চেষ্টায় ক্ষুদিরাম মুক্তি পান। কিন্তু সত্যেন বসুর চাকুরিটি যায়। এই সকল ঘটনার ফলে বাংলাদেশের উভয় লাটই বিপ্লবী মহলে এবং জনমানসে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি; সুতরাং লাট হত্যার ফলে বিপ্লবীদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। কার্যোদ্ধারের ভার পড়ল বারীন্দ্রপরিচালিত কর্মীদের উপর। এই সময়ে ফুলার ছিলেন শিলঙে। স্থির হল শিলঙ রোডেই লাটকে হত্যা করতে হবে। রংপুরের মণি লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে বারীন্দ্রকুমার শিলঙ রওনা হয়ে গেলেন। অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু এই সময়ে শিলঙে কৃষি বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর। অরবিন্দের চিঠি নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের অছিলায় বিপ্লবীদ্বয় ভূপাল বাবুর গৃহে আশ্রয় নিলেন। অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বারীন্দ্রকুমারের হাতে এক হাজার টাকা দিলেন এবং কার্যোদ্ধার হলে আরও টাকা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিলঙে লাটের সন্ধান পেতে

বিপ্লবীদের অসুবিধা হল না। লাট সাহেব অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে শিলঙ সার্কুলার রোডে বেড়াতেন। কিন্তু চক্রাকার সার্কুলার রোডের কোন্ স্থানটা লাট হত্যার পক্ষে অনুকূল তাই স্থির করতে কয়েকদিন গেল। এরপরে লাট সাহেবকে গুলি করে টাঙ্গা যোগে কোন পথে গৌহাটি সরে পড়া সম্ভব তারই সন্ধান চলতে থাকে। ইতিমধ্যে একদিন রিভলবার নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে মণি লাহিড়ীর ডান হাতের তালু ছিদ্র হয়ে গেল। ভূপাল বসু তখন অফিসে। মণির চিকিৎসার ব্যবস্থা হল গোপনে। কিন্তু এর পরে ভূপাল বাবুর গৃহে বিপ্লবীদের অবস্থান করা সম্ভব হল না। আর লাট সাহেবও শিলঙ ছেড়ে পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়ে পড়লেন। বারীন্দ্র এবং মণিও তাঁকে গৌহাটিতে ধরবার জন্য রওনা হলেন। গৌহাটির পথে অপ্রত্যাশিতভাবে হেমচন্দ্র কানুনগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বারীন্দ্রকুমারের অযথা বিলম্ব দেখে অরবিন্দ লাটবধের জন্য তাঁকেই পাঠিয়ে দেন। এর ফলে তিন বিপ্লবী লাটবধের জন্য গৌহাটিতে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁরা গৌহাটিতেও লাটকে ধরতে পারলেন না। ভ্রমণ-সূচী সংগ্রহ করে দেখা গেল এরপরে গন্তব্য স্থান বরিশাল। তাঁরা ষ্টীমারযোগে বরিশাল রওনা হলেন। কিন্তু বরিশালে পৌঁছে দেখলেন লাট সাহেবের ষ্টীমার "ব্রহ্মকুণ্ড" অদূরে নোঙর করা রয়েছে। বিপ্লবীরা বরিশালে অশ্বিনী দত্তের গৃহে অতিথি হলেন। কিন্তু এবারেও ফুলার সাহেব অনাহত অবস্থায়ই বরিশাল ত্যাগ করলেন। বরিশালে বিপ্লবীদের কর্মসূচীর কিছুটা পরিবর্তন হল। বরিশালে দক্ষযজ্ঞ নাশের নায়ক ইমার্সন সাহেবকে হত্যাই প্রথম কর্তব্য বলে মনে হল বিপ্লবীদের। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হল না। বিপ্লবীরা লাট সাহেবকে অনুসরণ করে রংপুর এলেন। তাঁরা এতদিনে বুঝেছেন যে শহরের মধ্যে লাট সাহেবের সান্নিধ্যে পৌঁছানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রেল লাইনে বোমা রেখে এখানে লাটবধের ব্যবস্থা হল। এদিকে বারীন্দ্রকুমারের কাছে যে এক হাজার টাকা ছিল তা এতদিনে ফুরিয়ে গিয়েছে। টাকার জন্য হেমচন্দ্রকে পাঠানো হল অরবিন্দের কাছে। অরবিন্দ ২২টি টাকা দিলেন এবং ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। নরেন গোঁসাই ডাকাতির জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাই অরবিন্দ এবার তাকেই পাঠালেন রংপুরে ডাকাতি করবার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে ঐ গ্রামে অপ্রত্যাশিতভাবে দারোগার উপস্থিতিতে বিপ্লবীদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিমুখ হয়েই ফিরতে হল। কিন্তু এই সময়ে বিপ্লবীরা সংবাদ পেলেন লাট সাহেব রংপুর আসবেন না। তিনি ধুবড়ী থেকে গোয়ালন্দ যাবেন এবং সেখানে অভিনন্দনের পর তিনি বিলেত যাত্রা করবেন।

লাট সাহেবের সফরকালে এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। লাট সাহেব পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ গেলে সেখানকার বি এল স্কুল পরিদর্শন করতে যান। কিন্তু লাট সাহেব সামনের দরজা দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতেই ছাত্রগণ 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে স্কুল পরিত্যাগ করে। লাট সাহেব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে স্কুলটির অনুমোদন অবিলম্বে বাতিল করার জন্য লিখলেন এবং অন্যথায় তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে বললেন। বড়লাট এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখার্জিকে জানিয়ে স্কুলটির অনুমোদন বাতিল করতে বললেন। আশুতোষ পত্র পেয়ে কমিটির মিটিং ডাকলেন। আশুতোষ সহ কমিটির অভিমত এই হল যে, ছাত্রগণ অনেক সময় এরূপ করেই থাকে। সুতরাং স্কুলের অনুমোদন বাতিলের কোন কারণ দেখা যায় না। এই পত্র পেয়েই বড়লাট ফুলারকে তার করে জানালেন—"Your resignation accepted." এর ফলেই ফুলার আর রাজধানী ঢাকাতে না গিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে ট্রেন ধরে বোম্বে হয়ে বিলেতে চলে যান। হেমচন্দ্র ও প্রফুল্ল চাকী তৎক্ষণাৎ গোয়ালন্দ রওনা হলেন। বারীন্দ্রকুমার রংপুর থেকে কলকাতা ফিরে এলেন। কিন্তু এসময় বন্যা হওয়ায় বিপ্লবীদের গাড়া গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছালো না। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের কলকাতা ফিরে আসতে হল। লাট হত্যার শেষ চেষ্টা হল নৈহাটিতে। কিন্তু এখানেও লাট সাহেবের ট্রেন নৈহাটি ষ্টেশন পর্যন্ত না গিয়ে একটু দূর থেকেই বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হয়ে গেল। বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। কলকাতা পৌঁছে অরবিন্দকে সব বলতে তিনি বললেন,—"আজ না হয়েছে পরে হবে।" ১৯০৬ সালের জুন-জুলাই মাসে ফুলার বধের চেষ্টা হয়েছিল।

যুগান্তর কাগজে খোলাখুলি বিপ্লব প্রচারের ফলে বিপ্লবীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব হল না। বোমার মামলায় উল্লাসকর তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, যুগান্তর পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গঠনের আয়োজন করা হচ্ছে এবং তাই দেখেই তিনি বারীন্দ্রের সন্ধান করে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি দলভুক্ত হন। এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে। এর ফলে দুই-একবার সতর্কতামূলক পত্র এল এবং তার পরেই আরম্ভ হল পূর্ণ লাহিড়ী ও ইনসপেক্টর এলিস সাহেবের ঘন ঘন যাতায়াত। পরবর্তী পন্থা পত্রিকাদলন। সম্পাদক হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হলেন ১৯০৭ সালের ৫ই জুলাই। ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হল, ২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপ্লবীরা বুঝলেন তাঁদের উপর

দৃষ্টি পড়েছে। বেশীদিন অবাধে আর বিপ্লব প্রচার চলবে না। তাই নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক এবং অন্যান্য কয়েকজনের হাতে যুগান্তর পরিচালনার ভার অর্পণ করে বারীন্দ্র, অবিনাশ, উল্লাসকর, বিভূতি, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লবেব আয়োজনে ব্রতী হলেন। এবারের প্রথম লক্ষ হল পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজার। এজন্য বোমা প্রস্তুত করে দেন উল্লাসকর। বোমার আঘাতে লাটের গাড়ী উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালেব নভেম্বর মাসে মানকুণ্ডু যান বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর এবং নরেন গোঁসাই। ঐ সময়ে ছোট লাট রাঁচি যাচ্ছিলেন। স্থির হয় যে, উল্লাসকর নিজেই বোমাটি রেল লাইনের উপর রেখে আসবেন। কিন্তু বোমা রাখতে যখন যাবেন ঐ সময়ে কিছু লোক এসে পড়ায় তাঁকে আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু ঐ সময়ে লাটের ট্রেন এসে পড়ায় উল্লাসকর কয়েকটি কার্তুজ লাইনের উপর রেখেই চলে আসেন। ফলে সামান্য বিস্ফোরণ ঘটলেও ট্রেনের বিশেষ ক্ষতি হল না।

এর অল্প কয়েকদিন পরে লাট হত্যার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল ঐ মানকুণ্ডুতেই। উল্লাসকর, বারীন্দ্র, শান্তিপুরের বিভূতি সরকার এবং প্রফুল্ল চাকী চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মধ্যবর্তী কোন স্থানে গর্ত খুঁড়ে বোমাটি স্থাপন করেন। কিন্তু লাটের গাড়ী ঐ পথে না আসায় বিপ্লবীদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল।

লাট হত্যার তৃতীয় প্রচেষ্টা হল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে। মাইন-বোমার সাহায্যে এনড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল গাড়ী উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। উল্লাসকরের তৈরী মাইন বোমা নিয়ে বারীন্দ্রকুমার, বিভূতি এবং প্রফুল্ল চাকী গর্ত খুঁড়ে বোমাটি স্থাপন করলেন। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার বলেন—"আমাদের সঙ্গে একটি ঢাকনী দেওয়া লৌহপাত্রে ৬ পাউণ্ড ডিনামাইট ভর্ত একটি মাইন ছিল। স্পিরিট, এসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দিয়া তৈরী ফিউজ উহাতে আঁটা ছিল। উহা একটি কাগজের মধ্যে রক্ষিত ছিল, উহার সহিত একটি সীসার নল যুক্ত ছিল। রাত্রি ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে মাইনটি পাতি। তাহার পর আমি নারায়ণগড় হইয়া রাত্রির শেষ যাত্রীবাহী ট্রেনে কলিকাতা ফিরিয়া আসি।"

এবারের বিস্ফোরণে লাটের গাড়ীর কিছু ক্ষতি হলেও লাট সাহেব স্বয়ং অক্ষত ছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কয়েকজন কুলিকে গ্রেপ্তার করে। সাজানো মামলার সাজানো স্বীকারোক্তির ফলে কয়েক জন কুলি দণ্ডিত হয়। এর সমস্ত কৃতিত্ব এই দেশের পুলিশের। আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, বিভূতি সরকার প্রভৃতির স্বীকারোক্তিতে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেলে কুলিরা মুক্তি পায়।

এর পরে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যালকে হত্যার চেষ্টা হয় ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল। হেমচন্দ্র কানুনগোর তৈরী বোমা নিয়ে বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায় এবং নরেন গোঁসাই চন্দননগরে যান। নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, মেয়র পুলিশের সাহায্যে স্বদেশী সভা ভেঙে দিয়েছিলেন। এই জন্য বিপ্লবী দল তাঁদের কাজে জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে এই পথ গ্রহণ করেন। বারীন্দ্র কুমার তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেন যে, এই ঘটনায় তিনি নিজে, যশোহরের ইন্দুভূষণ রায় এবং শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই ছিলেন। কিন্তু নরেন গোঁসাই তার স্বীকারোক্তিতে বলে যে হেম কানুনগো, নিরাপদ রায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বারীন্দ্র, বিভূতি এবং সে নিজে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে বলে যে, হেমচন্দ্রের বাড়ী থেকে তিনটে বোমা এবং একটি ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন। এই স্বীকারোক্তিতে অতিরিক্ত নামগুলি সম্ভবতঃ পুলিশের কীর্তি। নরেন গোঁসাই আরও বলে, "আমার হাতে যে রিভলভারটি ছিল তা মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সত্যেনের। চন্দননগর হইতে আসিয়া রিভলভারটি মানিকতলায় জমা দিই।" মেয়র যখন রাত্রিবেলা সস্ত্রীক নৈশভোজন করছিলেন ইন্দুভূষণ জানালা দিয়ে বোমাটি কক্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বোমা প্রস্তুতিতে কোনরূপ ত্রুটি থাকায় বোমাটি ফাটেনি।

চন্দননগরের এই বোমাই হেম কানুনগোর তৈরী প্রথম বোমা। তিনি বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখবার জন্য পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে ইউরোপ যাত্রা করেন এবং ফরাসী দেশে গিয়ে ম্যাডাম কামা ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সাহায্যে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখে আসেন। কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্রের কিছুটা অসুবিধা ছিল। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। ১৯০৬ সালের আগষ্ট থেকে ১৯০৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত তিনি ইউরোপে ছিলেন।

প্রথম বোমা তৈরীর চেষ্টা হয় উল্লাসকরের উদ্যোগে। এই বোমার পরীক্ষা হয় দেওঘরের রোহিণী পাহাড়ে। এখানে বোমা তৈরী করতে গিয়ে রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তীই বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ। তিনি রংপুরের উকিল ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র।

বোমা তৈরীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চলে ঢাকুরিয়ার লাউডগা সাপসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো বাড়ীতে। এই বাড়ীটি সেদিন কোথায় ছিল বর্তমানে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। এই সুযোগে কলেজের গবেষণাগার থেকে কিছু কিছু বোমা তৈরীর উপকরণ নিয়ে এসে উল্লাসকর নিজগৃহে বোমা তৈরীর একটি ক্ষুদ্র

কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তখনও তিনি বিপ্লবী দলভুক্ত হন নাই। হেমচন্দ্র ফিরে আসার পরে উল্লাসকর তাঁর সহকর্মী হন বোমা তৈরীর কাজে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে হেমচন্দ্র ফিরে আসার আগেই মানিকতলা মুরারিপুকুরে বোমা তৈরী আরম্ভ হয়।

মানিকতলার ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডে ছিল অরবিন্দ-বারীন্দ্রের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের বাগান বাড়ী। সাত বিঘা বার কাঠা স্থান জুড়ে বিরাট বাড়ী। সে সময়ের কলকাতায় এটা ছিল প্রায় লোকালয়-বহির্ভূত। স্থির হয়, নবাগত বিপ্লবীদের ধর্মচর্চা, শরীরচর্চা ও রাজনীতি শিক্ষার সঙ্গে বোমা তৈরীও হবে এইখানেই। বিপ্লবী সমিতির নিয়ম অনুযায়ী বাগানে মাছ মাংস ডিম পিঁয়াজ প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গীতার ক্লাস নিতেন উপেন্দ্রনাথ। তিনি বাগানে সন্ন্যাসী বেশে থাকতেন। বাগানে বহু ব্যক্তির হৈ চৈ-এর মধ্যে বোমা তৈরী করতে হেমচন্দ্র সম্মত হলেন না। এজন্য ভবানীপুরে আলাদা করে বোমা তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করা হল। এখানে এবং মুরারিপুকুরেও বিপ্লবীরা নিজেরাই পালাক্রমে রান্নাবান্না করতেন। বাগানে থাকতেন উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি সরকার, পরেশ মৌলিক, নলিনীকান্ত গুপ্ত, কুঞ্জলাল সাহা, শচীন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র নাগ এবং আরও কয়েকজন। অরবিন্দ ১৯০৬ সালের ২৩শে আগষ্ট বরোদার চাকুরি ছেড়ে এসে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

মানিকতলার বিপ্লবীদের বিপ্লবাঙ্কের শেষ অধ্যায় রচিত হয় মজঃফরপুরে। সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে সেদিনের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড কুখ্যাত হয়েছিলেন। সবগুলি মামলার বিচারই তাঁর আদালতে হয় এবং আসামীরা সকলেই দণ্ডিত হন। বিশেষ করে বন্দেমাতরম্ মামলার বিচারের দিনে বিপিনচন্দ্র পাল যেদিন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন, সেদিন আদালতে জনসমুদ্রের মধ্যে ১৫ বৎসরবয়স্ক বালক সুশীল সেনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ডাদেশ শুধু বিপ্লবীদেরই নয়, সমগ্র জনতাকেই উত্তেজিত করে তুলেছিল। ফলে অরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক এবং চারু দত্ত জজের গোপন বিচারে কিংসফোর্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করার জন্য একখানি বড় পুস্তকের মধ্যে সুকৌশলে বোমা স্থাপন করে তা প্যাক করে দলের পরেশ মৌলিক গিয়ে সাহেবের আরদালীর হাতে দিয়ে এলেন তাঁর ভবনে। ব্যবস্থা এরূপ ছিল যে প্যাক খুলবার সময়ে যেটুকু চাপ পড়বে তাতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু আরদালী বইখানা সাহেবের হাতে না দিয়ে আলমারিতে রেখে দেয়। ফলে

সে-যাত্রা কিংসফোর্ড রক্ষা পেলেন। বোমার মামলায় স্বীকারোক্তিতে বিষয়টি জানা যায়।

এই সময়ে কিংসফোর্ড বদলী হয়ে কলকাতা থেকে মজঃফরপুর গেলেন। বিপ্লবী দলে স্থির হল মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু এবং বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করবেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষে দুই বিপ্লবী মজঃফরপুরে পৌছলেন। মজঃফরপুরে দুজনে গিয়ে উঠলেন মাহাতো এষ্টেটের ধর্মশালায়। দুজনেই দুজনের কাছে অপরিচিত। প্রফুল্ল চাকীর নাম দীনেশচন্দ্র রায় এবং ক্ষুদিরামের নাম দুর্গাদাস সেন। মাসাধিককাল ধরে পর্যবেক্ষণের পর বোমা নিক্ষিপ্ত হল ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে। কিন্তু বিপ্লবীরা গাড়ী ভুল করে ফেললেন। ফলে এই ঘটনায় মিসেস কেনেডী এবং মিস কেনেডী নিহত হলেন। ১লা মে ওয়াইনী ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এবং মোকামা ষ্টেশনে প্রফুল্ল গ্রেপ্তার হবার পূর্বে আত্মাহুতি দেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। নির্ভীকভাবে নির্বিকার চিত্তে শান্তভাবে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। বিংশশতকে বাংলা দেশে ক্ষুদিরামই প্রথমে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে জাতিকে মৃত্যুভয়াতীত হতে শিখিয়ে গেছেন।

১লা মে 'বন্দেমাতরম্' অফিসে নিউজ এজেন্সীর সংবাদে মজঃফরপুরের সংবাদ জানা গেল। অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ বাগানে সংবাদ পাঠিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সব সরিয়ে ফেলতে বললেন এবং বিপ্লবীদেরও সরে থাকতে বললেন। কিন্তু বারীন্দ্রের নেতৃত্বে এ সাবধান বাণী উপেক্ষিত হল। কিছু মাটি খুঁড়ে সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রাখা হল। শেষ রাত্রিতে পুলিশ দল যখন হানা দিল সন্তখোঁড়া মাটি দেখে সেসব অস্ত্র তুলে নিতে তাদের কোন অসুবিধা হল না। ২রা মে সমস্ত সকাল ধরে তল্লাসী চলল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণ সেন প্রভৃতি বাগানেই গ্রেপ্তার হলেন। কানাইলাল দত্ত এবং নিরাপদ রায় গ্রেপ্তার হলেন ১৫ নং গোপী মোহন দত্ত লেনে। হেমচন্দ্র কানুনগোকে গ্রেপ্তার করা হল ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ লেনে। অরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং শৈলেন বসুকে গ্রেপ্তার করা হল ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে। দীনদয়াল বসু গ্রেপ্তার হলেন এর পরের দিন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোতে। ১০ই মে সুধীর সরকারকে খুলনা জেলায় তাঁর নিজ গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল। ১২ মে কৃষ্ণজীবন সান্যাল গ্রেপ্তার হলেন মালদহের কানসাটে তাঁর নিজ বাড়ীতে। অরবিন্দের নির্দেশ পেয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই

করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে সরিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ সম্ভবতঃ নজর রাখছিল। কারণ, ২রা মে ঐ বাড়ীও তল্লাসী হল এবং সেখান থেকে ধরণী গুপ্ত, নগেন গুপ্ত এবং অশোক নন্দীকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তার হলেন তিন ভাই ধীরেন সেন, হেম সেন এবং সুশীল সেন। হৃষীকেশ কাঞ্জিলালকে তাঁর চাতরার বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল।

৪ঠা মে ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির নিকট ১৪ জন আসামীকে হাজির করা হল। হস্তগত কাগজপত্র দেখে এবং আসামীদের স্বীকারোক্তির ফলে এর পরে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ হরিকান, প্রভাসচন্দ্র দেব, চারুচন্দ্র রায় এবং হরিদাস দত্ত। প্রাথমিক তদন্তের ফলে বার্লি সাহেব কোন প্রমাণ নেই বলে ৪ জনকে মুক্তি দেন। এঁরা হলেন বিজয়-রত্ন সেন, মতিলাল বসু, হরিদাস দত্ত এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুবাবু যেহেতু ফরাসী প্রজা সেহেতু বৃটিশ আদালতে তাঁর বিচার চলতে পারে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির ফলে ৮ মে নরেন গোঁসাই'এর গ্রেপ্তারের পর মামলার মোড় পুলিশের অনুকূলে ঘুরে গেল। গ্রেপ্তারের পরেই সে সম্ভবতঃ দুর্বলতা দেখিয়েছিল। এজন্য জেলে তাকে আলাদা করে রাখা হয়। ২৩শে জুন সে প্রথমে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায় এবং অবলীলাক্রমে সত্য মিথ্যা নানা ঘটনা জড়িয়ে এক বিবৃতি দেয়। ঐ বিবৃতিতে সে অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক, চারু দত্ত, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, যতীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, চারু রায় প্রভৃতিকে জড়ায়। তার ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য আরও মারাত্মক হবে মনে করে তার আগেই তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কার্যে উদ্যোগী হলেন হেম কানুনগো ও সত্যেন বসু।

এই সময়ে বন্দীদের মধ্যে চলছিল জেল থেকে পলায়নের এক পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে চন্দননগরের দল, বিশেষভাবে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বন্দীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবার জন্য বসন্তকুমারের কলকাতার বাসায় একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল। অপর একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল সখারাম গণেশ দেউস্কর ও নরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। এই দুই স্থান থেকেই বন্দীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হত। বন্দীদের মুড়ি পাঠানো হত ঠোঙ্গায়। এই ঠোঙ্গায় সাঙ্কেতিক লিপিতে সংবাদ পাঠানো হত। সখারাম বাবুর ভাগিনেয় বালাজী পাড়ারকর ব্যবস্থা করলেন

জেল থেকে বেরোবার পর বন্দীদের উত্তর ভারতে নিয়ে যাবার। হাসপাতালের ডাক্তারদের মাধ্যমে বন্দীদের নিকট সংবাদ পাচার হত। পলায়নের সুবিধার জন্য বন্দিগণ জেলে কয়েকটি রিভলভার চেয়ে পাঠালেন। একটি বাণ্ডিলে ২টি রিভলভার দেওয়া হল উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে। দিয়ে এলেন বসন্তকুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চন্দননগরের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীশ ঘোষ। আরও ২টি রিভলভার সখারাম বাবুর নিকট দেন নরেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতকের বাংলার তথা ভারতের নবচেতনা লক্ষ্য করে, বিশেষতঃ ১৮৫৭ সালের আঘাতের পর ইংরেজ শাসক প্রজারঞ্জনের মুখোশ পরে ভারতবাসীর মন জয়ের চেষ্টা করে এবং আবেদন-নিবেদনসর্বস্ব তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসকে উৎসাহিত করার কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু অচিরেই সে কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। শুরু হল দমন-পীড়ন। ভারতীয় জনমানসে তখন বাঙ্গালী মনীষার প্রভূত প্রভাব। সুতরাং বাঙ্গলার অঙ্গচ্ছেদ করে সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার ব্যর্থ প্রয়াসে ইংরেজ ব্রতী হয়। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলার নবচেতনায় আঘাত করাই তার মূল উদ্দেশ্য। ফল হল উল্টো। নবজাগ্রত জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হল। এরই নাম বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন।

১৮৯৮ সালের শেষ দিকে ভারতে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এসে স্তোকবাক্য শুরু করেন, 'I love India, its people, its history, its Government, the complexities of its civilization and life." তাঁর ভারত শাসনপর্বে গোড়ায় ভারতীয় জনমনে খানিকটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সৃষ্টি যে হল না তা নয়। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল এই অমৃতময় বাণীর পশ্চাতে রয়েছে বিষবাষ্প। অচিরেই শুরু হল আইনের আশ্রয়ে পীড়নের পালা। প্রথমতঃ ইউনিভার্সিটি বিল পাশ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজসমূহ এবং আইন কলেজ বাতিল করা হল। রোনাল্ডসে তাঁর "Life of Curzon" পুস্তকে লিখেছিলেন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন দম্ভ করে ভারত সচিবকে জানিয়েছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করাই হবে বড়লাট রূপে তাঁর প্রধান কাজ। কার্জনের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হল কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাঙালী এ আক্রমণ নীরবে মেনে নিল না। তার প্রতিবাদের কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বাংলার সর্বত্র। এবার রাজ-প্রতিনিধি চূড়ান্ত আঘাত হানবার কৌশল গ্রহণ করলেন। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি। বাংলার বুকে এই অশনিপাতের পূর্বাভাষ তিনি দিলেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এই বজ্রপাতে মৃত্যুর ছায়া না দেখে না বাঁচবার পথ খুঁজে পেল। তার ক্ষোভ ক্রোধের আগুনে পরিণত হল।

কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই বড়লাট জানালেন, তাঁর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অনড়। পরবর্তী ১৬ই অক্টোবর সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হল। কিন্তু এর আগেই ৭ই আগষ্ট টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হল। সে উত্তেজনার আগুন স্পর্শ করে নাই এমন লোক ছিল না। আবালবৃদ্ধবনিতার অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাঘাত বুঝি বড় নির্মমভাবে বেজেছিল এবং তার প্রতিশোধ কামনায় অন্তরে বৃশ্চিকজ্বালার মত তীব্র অনুভূতি সেদিন জাতিকে পাগল করে তুলেছিল। বাঙালী হতাশ না হয়ে আঘাতের জবাবে নূতন অস্ত্র "বৃটিশ পণ্য বর্জন" আন্দোলনের প্রত্যাঘাত নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ চলে নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরে। জন্ম লাভ করে বিপ্লবী বাংলা। এ সংগ্রামে কার্জনী আঘাতই একমাত্র আঘাত ছিল না। আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ইংরেজ স্বদেশী আন্দোলন এবং ক্রমবর্ধমান বিপ্লব আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দেশপূজ্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্রনাথ বসু, পুলিন-বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী করে নির্বাসিত করা হয়। জনমত গঠন এবং সরকার-বিরোধী প্রচার দমন করাই ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়। এর জন্য নূতন নতন আইন প্রণীত হয়। সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং মুদ্রাযন্ত্রের মালিককে সরকারের নিকট টাকা জমা রাখতে বাধ্য করা হল। আপত্তিজনক কিছু ছাপা হলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হত, তৃতীয়বার অপরাধ হলে মুদ্রাযন্ত্রটিই বাজেয়াপ্ত হত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৯, এই দশ বৎসরে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র এবং ৩৩০টি পত্রিকা দণ্ডিত হয় এবং ছয় লক্ষ টাকা জামীন দাবী করা হয়। পাঁচশত মুদ্রিত পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়। ১৩০টি পত্রিকা জামীন দিতে না পারায় বাজেয়াপ্ত হয়।" বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য ভারত সরকারের কঠোর দণ্ড বিধানে ভারতসচিব মর্লি পর্যন্ত উদ্বেগ বোধ করেন। মর্লি তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোকে লিখেন: "একটী বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা রাখার জন্য গ্রন্থকারের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছে, এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিলাম। সামান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাও আইনবিরুদ্ধ।" শাস্তি বিধানের এইসব উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বড়লাট মিন্টোকে লিখেছিলেন, "এই প্রকার দণ্ড অমানুষিক এবং বর্বরোচিত। ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উপায় নহে। ইহার একমাত্র পরিণতি বোমা তৈরী। (বাংলার

ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ১৫০ পৃঃ)

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঢাকায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা। ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে ঢাকা সমিতির একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। এই সমিতি এতদূর শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে এই প্রতিষ্ঠানই সমগ্র ভারতে অনুশীলন সমিতি নামে পরিচিত হয়। বঙ্গভঙ্গের কিছু আগে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ঢাকাতে যান। ঢাকার নবাবের আসানমঞ্জিল প্রাসাদে বড়লাটকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশ হয়। কার্জনের সম্বর্ধনার জন্য লাঠি খেলা দেখাবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল মার্তাজাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে মার্তাজা কিছুদিন ঢাকাতেই অবস্থান করেন। ঢাকা কলেজের মাঠে একদিন মার্তাজার লাঠি খেলা, অসি খেলা এবং অন্যান্য ক্রিয়াকৌশল দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিনবিহারী দাস ছিলেন এই সময়ে ঢাকা কলেজের ল্যাবোরেটরী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এবং ডিমোনষ্ট্রেটর। তিনি এবং তাঁর বন্ধু ভূপেশ নাগ মার্তাজা সাহেবের নিকট লাঠি খেলা শিখতে থাকলেন। মার্তাজা এর আগে কলকাতা সমিতিতেও লাঠি খেলা শেখাতেন। তিনি পুলিন বাবুকে বলেন যে, এশিয়াকে ইয়োরোপ ও খৃষ্টের প্রভাবমুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য। মার্তাজা ঢাকা ত্যাগ করার পরেও পুলিনবাবু মাঝে মাঝে গিয়ে শ্রীরামপুরে তাঁর কাছে লাঠি খেলা শিখে আসতেন। পুলিনবাবু ঢাকাতে ইলিসিয়াম মেসে থাকতেন। বন্ধু সুরেশ নাগ ও তাঁর ভাই ভূপেশ নাগকে এখানে তিনি লাঠি খেলা ও অসি খেলা শেখাতে থাকেন। এর পরে পুলিনবাবু তাঁর মামার বাসার এক কোণে লাঠি খেলার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে গগন দাস, আশু দাসগুপ্ত এবং ক্ষীরোদ চক্রবর্তী এসে লাঠি খেলার আসরে যোগ দিলেন। উয়ারীতে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানেও লাঠি খেলা চলতে লাগল। এখানে পুলিনবাবুর সঙ্গে লাঠি খেলতেন সুরেন নাগ, যোগেন নাগ, উপেন নাগ, ভূপেশ নাগ এবং জ্যোতিষ মজুমদার প্রভৃতি।

এরপরে রাজার দেউরিতে লাঠি খেলার আর একটি আড্ডা খোলা হল। এখানে লাঠি খেলতেন শিশির গুহরায়, প্রফুল্ল কবিরাজ, দীনেশ গুহ মুস্তাফি, ক্ষিতীশ মুখার্জী, খগেন্দ্র চৌধুরী, হেম ঘোষ, হেমেন্দ্র রক্ষিত. অতুল রায় চৌধুরী প্রভৃতি। পরে নরেন সেন, প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, শচীন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতি এখানে লাঠি খেলায় যোগ দেন। শিশির গুহরায় এবং শচীন্দ্র ব্যানার্জী পরে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন সাহেবকে গুলী করেন। ইহা ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। তাঁদের সহযোগী তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন সত্যেন বসু। এর আগে বাংলা

দেশে আর কোন বিপ্লবী প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। দীনেশ গুহ মুস্তাফি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। খগেন্দ্র চৌধুরী বরিশাল ষড়যন্ত্র, বরাহনগর ষড়যন্ত্র এবং রাজাবাজার মামলার আসামী ছিলেন। প্রিয়নাথ দাস-গুপ্ত পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন এবং প্রিয় মহারাজ নামে পরিচিত হন। শচীন ব্যানার্জী ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টায় কেহ ধরা পড়েন নাই। ১৯০৫ সালে বীরাষ্টমীর দিনে পুলিনবাবু প্রকাশ্য লাঠি খেলার প্রদর্শনী করেন। কিছু দিন পরেই লক্ষ্মীবাজারে একটি নূতন আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে লাঠি খেলতেন হিরণ্ময় গুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় রায়। নৃপেন চক্রবর্তী ও হিরণ্ময় গুপ্ত গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর শরৎ ঘোষকে গুলী করার মামলায় আসামী ছিলেন। মাহুতটুলীতে লাঠি খেলার আর একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অমৃত হাজরা, যতীন রায় প্রভৃতি এখানে লাঠি খেলতেন। অমৃত হাজরা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন। মুক্তির পরে আবার রাজাবাজার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বীরাষ্টমী উৎসবের কয়েক দিন পরে ১৯০৫ সালের পূজার ছুটির মধ্যেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনে প্রচার সম্পর্কে ঢাকার ছাত্রদের আহ্বানে বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় আসেন। ঐ একই ট্রেনে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও ময়মনসিংহ যাচ্ছিলেন। বিপিন পালের নির্দেশে ছাত্রগণ মিত্র মহাশয়কেও ঢাকায় নামতে অনুরোধ করেন। বিপিন পাল নিজেও অনুরোধ করায় শ্রীমিত্র ঢাকায় অবতরণ করেন। শ্রীমিত্র পূর্ববঙ্গে বিপ্লবী সমিতি প্রসারের উদ্দেশ্যে সুহৃদ সমিতির আহ্বানে ময়মন-সিংহ যাচ্ছিলেন। ময়মনসিংহে সরলা দেবী এবং হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের উদ্যোগে বিপ্লবী সুহৃদ সমিতি পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাকে মূল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত করাই মিত্র সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। প্রমথনাথের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জনে স্থায়ী সংগঠন প্রচেষ্টা। ঢাকায় প্রথম জনসভা হল বুড়ি-গঙ্গা-তীরে জমিদার সনাতন বাবুর ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে। বিপিন পাল এবং প্রমথনাথ উভয়েই বক্তৃতা করলেন। তৃতীয় দিনে ছাত্রসভা আহূত হল সন্ধ্যা-বেলা বাবুর বাজার পুলিশ সেক্সনের উপর তলার হল ঘরে। প্রথমেই বিপিন পাল ছাত্রদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনে যে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রয়োজন তাও বললেন। এ ঘটনা সম্পর্কে পুলিনবিহারী লিখেছেন—

"মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে একটী দোতলা বাড়ীতে পি. মিত্র ও বিপিন পালের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঠিক নিম্নতলে একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরেই বিপিন পাল ও পি. মিত্র স্বদেশী সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনির

সহিত তাঁহাদের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইল। কতিপয় উকিল, যুবক এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মধ্যে হঠাৎ পি. মিত্র বলিয়া ফেলিলেন—"এ সমস্ত স্বদেশা-ফদেশী বিলাতী বর্জনে কিছুই হবে না। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও নয়ত মর'। কয়েকজন উকিল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'এ যে অসম্ভব, এ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে'। অর্থাৎ ইংরাজ তাড়ান অসম্ভব। কিন্তু পি-মিত্র উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া দম্ভের সহিত বলিলেন, 'আমরা আর ফিরিতে পারি না। The sword has been drawn, it must be thrushed either in the breast of our enemies or in our own breast'। বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুই-তিনবার সবেগে আপন বক্ষে করাঘাত করিলেন। অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল—'আমরা ভাই এ সবের মধ্যে নাই' বলিতে বলিতে কেহ কেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কেহ বা ফিসফাস করিয়া নানারকম বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকজন যুবক ও ছাত্র পি-মিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সেই রাত্রিতেই পি-মিত্র সুহৃদ সমিতির আহ্বানে ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন এবং পরের দিন বিকালে ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন। একদল ছাত্র ও যুবক গোপনে পি-মিত্রের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচনা সেই রাত্রে এবং পরের দিন সকালেও চলিয়াছিল। তারকনাথ দাস এবং কলকাতার কয়েকজন যুবক যাহারা বিপ্লববাদ প্রচারহেতু গোপনে পূর্ববঙ্গে ঘোরাফেরা করিতেছিল তাহারা এবং ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির সুগায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি ঐ গোপন আলোচনায় যোগ দিয়াছিল। স্থির হইল ঢাকায় একটি বিপ্লবী দল সৃষ্ট করিতে হইবে। সমস্ত যুবক এক নেতার অধীনে উঠিবে ও বসিবে, তাঁহার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিবে।'

পুলিনবাবু আরো বলেন ,"পূর্বব্যবস্থা অনুসারে পরদিন সকালে বিপিন পাল ও পি-মিত্তিরের সম্মুখে বহু ছাত্র-যুবক সমবেত হইল। কয়েকজন উকিলও যোগদান করিলেন। আনন্দ চক্রবর্তী উকিল-মহাশয়কে ডাকিয়া আনা হইল। বিভিন্ন আলোচনা ও প্রস্তাবনার পরে স্থির হইল, এক নেতার অধীনে তাঁহার সর্বরকম আদেশ পালন করিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছে জানাইয়া তিয়াত্তর জন ছাত্র ও যুবক নাম লিখাইয়া দিলেন। আনন্দ চক্রবর্তী সমিতির অধিনায়ক হইলেন। আনন্দ চক্রবর্তীও সামান্য বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া ছাত্র-যুবকদিগকে কর্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর প্রশ্ন উঠিল—সমিতির পরিচালক কে হইবে? দুইটী বলিষ্ঠ ও সবলকায় যুবক যোগেন্দ্র নাগ ও নিশি চৌধুরী

আমার নাম প্রস্তাব করিল। এতক্ষণ আমি দর্শক মাত্রই ছিলাম, আলোচনায় যোগ দেই নাই। কিন্তু আমার দীন বেশ ও ক্ষীণ দেহ দেখিয়া অধিকন্তু আমি নির্জীব জড়বৎ বসিয়া আছি বলিয়া বোধ হয় পি-মিত্র উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না না এর মত লোক আমি চাই না। আমি চাই তোমাদের মত যুবক (নিশি ও যোগেন্দ্র), যে একটা মাত্র কথার দ্বারা অন্য সবাইকে বশে আনিতে পারিবে'। কিন্তু নিশি ও যোগেন্দ্র বলিল, 'ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা পারিবে না'। পি-মিত্র অন্যান্য যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়াও একই উত্তর পাইলেন। কিন্তু তার পরেও নিশি ও যোগেন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমাদের দুজনের একজন পরিচালক হও'। কিন্তু তাহারা বারবারই আমার নাম বলিতে লাগিল। তখন পি-মিত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন।"

"তারপরে প্রশ্ন উঠিল, সমিতির নাম কি হইবে? কেহ বলিল 'শক্তি সমিতি', কেহ বলিল 'বান্ধব সমিত', কেহ বলিল 'বন্দে-মাতরম্ সমিতি', ইত্যাদি। পি-মিত্র বলিলেন আমি কলকাতার সমিতির নাম দিয়াছি 'অনুশীলন সমিতি,' তোমরাও সেই নাম দাও। তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে একটা বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' প্রবন্ধ হইতেই আমি এই নামটা গ্রহণ করিয়াছি। 'অনুশীলন' শব্দের অর্থ চর্চার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা। আমরাও চর্চা ও পরীক্ষার দ্বারা যেখানে যাহা ভাল পাইব গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতির নাম 'অনুশীলন সমিতি' হইল, পি. মিত্র সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন।" (বিপ্লবের কথা)

এর প্রায় ছয় মাস পরে যে মাসে পি. মিত্রের আহ্বানে পুলিনবাবু কলকাতায় আসেন এবং তৎকালীন গুপ্ত সমিতির নিয়মানুযায়ী প্রমথনাথের নির্দেশে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। [অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় তখন ৪৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে। পুলিনবাবু সেক্রেটারী সতীশবাবুর অতিথি হন।] পুলিনবাবু তাঁর দীক্ষা গ্রহণের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন :—

"পি-মিত্রের আদেশ মত একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি-মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পচন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি-মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম (সিংহ শিকারের উপর লম্ফ প্রদানে উদ্যত)। আমার মস্তকের উপর গীতা স্থাপিত হইল। তদুপরি অসি ধরিয়া পি-মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন। উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র

পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি-মিত্রকে নমস্কার করিলাম।" ছান্দোগ্য উপনিষদের যে মন্ত্রটি পাঠ করে পুলিনবাবু পি. মিত্রের নিকট দীক্ষিত হন তা এই—

লোকদ্বারমপাবাণু´ পশ্যেম ত্বা বয়ং রাজ্যায়ো আ।
লোকদ্বারমপাবাণু´ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরাজ্যায়ো আ।
লোকদ্বারমপাবাণু´ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রাজ্যায়ো আ।
লোকদ্বারমপাবাণু´ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বরাজ্যায়ো আ।

'হে অগ্নিদেব, তুমি পৃথিবীব দ্বার উন্মুক্ত কর। আমরা যেন রাজ্যলাভের নিমিত্ত তোমাকে দর্শন করতে পারি।'

ঢাকায় ফিরে পুলিনবাবু নতুন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে এবং আসামের বহু শহরে এবং পল্লী অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হল। পুলিনবাবুর সংগঠনগুণে ঢাকা সমিতি অচিরেই এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হল।

মারাঠাকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এই সময়ে মারাঠা দেশে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বঙ্গবিভাগের পরে বাংলাদেশে এই উৎসব অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হলেন নব্য সমাজ। এ কার্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হোতা হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বালগঙ্গাধর তিলক, থাপার্দে এবং ডাক্তার মুঞ্জে উৎসবে যোগদান করলেন। উৎসবে ভবানী পূজারও ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী' কবিতা পাঠ করেন।

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে পুলিনবাবু যখন কলকাতায় আসেন তখন পি. মিত্র, পুলিনবাবু ও সতীশবাবু তিনজনে পরামর্শ করে সমিতির প্রতিজ্ঞাপদ্ধতি দুইভাগে ভাগ করেন। প্রথমত সমিতির সকল সদস্যের জন্যই একপ্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল। এবারে তা ভেঙ্গে আদ্যপ্রতিজ্ঞা এবং অন্ত্যপ্রতিজ্ঞা করা হয়। সমিতিতে প্রবেশ-কালে নতুন সদস্যগণ আদ্যপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবেন এবং বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে তাঁদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অন্ত্যপ্রতিজ্ঞায় দীক্ষা দেওয়া হবে। এই সুদক্ষ কর্মিদল সমিতির বৈপ্লবিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁদের কাজ হবে দেশদ্রোহী নিধন, ডাকাতির দ্বারা অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি। ঢাকায় ফিরে পুলিনবিহারী ঢাকার সদস্যগণকে অনুরূপভাবে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। আদ্য ও অন্ত্যপ্রতিজ্ঞা ব্যতীত প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা এবং দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা পুলিনবাবুর নিজের সৃষ্টি।

পরিচালকগণের সাংগঠনিক কৃতিত্বে অনুশীলন সমিতি বিশাল আকার ধারণ

করে। বিপ্লবী দলের কাজ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত ছিল—সাধারণ এবং বিশেষ কাজ। সাধারণ কাজ হবে সংগঠন, প্রচার ও বিক্ষোভ সৃষ্টি। বিশেষ কাজ সাতটি। এর মধ্যে দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে বিস্ফোরক প্রস্তুত করবার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণা, বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং ধনীদের উপর কর বসানো। পার্টির সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিভিন্ন আঞ্চলিক অংশ একটি সুগঠিত কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হবে। এর অধীনে থাকবে প্রাদেশিক সংগঠন, জেলা সংগঠন, শহর সংগঠন, গ্রাম সংগঠন এবং পার্টি সভ্য। কেন্দ্রের সকল কার্য পরিচালকের আদেশে পরিচালিত হবে। জেলা সংগঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রধান পরিচালন-কেন্দ্রের নিকট ত্রৈমাসিক কার্যবিবরণী পেশ করবেন: (১) জেলার সভ্যসংখ্যা, (২) সাধারণ অধিবাসীর বিবরণ, (৩) বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, (৪) যাতায়াত প্রভৃতি। সন্ত্রাসমূলক কার্যবিষয়ক: (১) সন্ত্রাসমূলক ঘটনা, (২) মুদ্রাজাল, (৩) অস্ত্র চালনা শিক্ষা। নিয়ম ছিল, পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ বা কোন মূল্যবান দ্রব্য সংগৃহীত হলে তা পার্টির সাধারণ তহবিলে জমা দিতে হবে। প্রত্যেক সভ্য পার্টি সংগঠনকে সামরিক সংগঠন বলে মনে করবেন এবং এর কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হবে। প্রত্যেক সভ্যকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি একটা বিপ্লবের ক্ষেত্র গড়ে তুলছেন। প্রত্যেক সদস্যকে বিভিন্ন স্তরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। প্রতিজ্ঞা নিম্নরূপ:

আদ্যপ্রতিজ্ঞা—আমি কখনই কোন অবস্থাতেই সমিতি ত্যাগ করিব না। আমি সকল সময় সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিব। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিচালকের আদেশ পালন করিব। আমি পরিচালকের নিকট কোন কথা গোপন করিব না।

অন্ত্যপ্রতিজ্ঞা—সমিতির ভিতরের কোনো কথাই আমি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না অথবা আমি কখনই কোনো কথা অনাবশ্যক আলোচনা করিব না। আমি পরিচালকের অনুমতি না লইয়া কখনই স্থান ত্যাগ করিব না। আমি যখন যেখানে থাকিব পরিচালককে জানাইব। যখনই সমিতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র জানিতে পারিব তখনই তাহা পরিচালককে জানাইব এবং তাঁহার নির্দেশে সেই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব। আমি যখনই যে অবস্থাতে থাকি না কেন পরিচালকের নির্দেশ পাইবামাত্র ফিরিয়া আসিব। আমি সমিতির মধ্যে আসিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা এমন

কোন লোককে শিখাইব না যে লোক এই সকল শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণ করে নাই।

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা—ওঁ বন্দেমাতরম্। ভগবান্ মাতা পিতা দীক্ষাগুরু পরিচালক এবং সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কারতেছি যে, এই সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন পূর্ণ না হইবে ততদিন আমি ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করিব না। আমি পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও সংসারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইব না। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকার মানসিক চঞ্চলতা ও দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। যদি এ প্রতিজ্ঞা পালনে অপারগ হই তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা—ওঁ বন্দেমাতরম্। ভগবান অগ্নি মাতা দীক্ষা-গুরু ও পরিচালককে সাক্ষী করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির উন্নতির জন্য আমি আমার জীবন ও সর্বস্ব পণ করিয়া সংগঠনের সকল কর্তব্য পালন করিব। আমি সংগঠনের সকল নির্দেশ পালন কারব এবং যাহারা আমার সংগঠনের ক্ষতি সাধন করিবে আমার সকল শক্তি দিয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষয় আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের বলিব না অথবা সেই সম্পর্কে অনাবশ্যক ভাবে সমিতির কোন সভ্যের নিকট জানিতে চাহিব না। যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।

ডাকাতি সম্পর্কে এক প্রকার দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইহা এইরূপ: স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতি-লব্ধ অর্থের এক কপর্দকও আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। যাহারা দেশদ্রোহী, স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরোধী, গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ, দরিদ্র ও দুর্বলের উৎপীড়নকারী, জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎকারী, অতিরিক্ত সুদখোর, কৃপণ ও ধনবান, কেবলমাত্র তাহাদের গৃহেই আমরা ডাকাতি করিব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতিদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিব না।

ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার অল্পদিন মধ্যেই পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। সমিতির সভ্য-বৃন্দকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী রূপে গড়ে তোলা হচ্ছিল। এই বাহিনীর নাম ছিল জাতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী। বাহিনীকে সকল সময় এই ভাবে প্রস্তুত রাখা হত যে, অগ্নিকাণ্ড, মহামারী, বন্যা বা অন্য যে কোনরূপ বিপর্যয়ে তারা যেন জনসাধারণকে দিবারাত্রি সাহায্য করতে পারে। ঢাকার ন্যাশনাল স্কুল সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। পুলিনবিহারী ও ভূপেশ নাগ এখানে শিক্ষকতা করতেন। পরে সোনারং এ আর একটা ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রচারবিমুখ ছিল—এমন মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। ইহার পরিচালকগণ সভ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অর্থাৎ স্কুল, কলেজ ও আখড়ার কার্যের উপর নির্ভর করতেন। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারের আশ্রয় না নিলেও এই সমিতির শক্তি যে সীমিত ছিল তা নয়। বারীন্দ্রকুমার এসে যোগ দেওয়ার আগে কলকাতার মূল সমিতিও প্রচার-বিরোধী ছিল। সর্বাধিনায়ক পি. মিত্রও প্রচার-বিরোধী ছিলেন। কতকটা তাঁর বিরোধিতা করেই বারীন্দ্রকুমার "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যে কলকাতা সংগঠনের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং তরুণ বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠান আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু সেদিকেও তাঁদের বিশেষ সাফল্য দেখা যায় না। লাটহত্যার কয়েকটি প্রচেষ্টার মধ্যে একটিও সফল হয় নাই। কিংসফোর্ড হত্যার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে এবং অসময়ে এই প্রচারের ফলেই নরেন গোসাই বিপ্লবী দলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সংগঠনের ভিত মজবুত না করে সম্মুখ সংঘর্ষের আহ্বান জানালে ফল লাভ হয় না।

প্রতিষ্ঠার পর মাত্র দেড় বৎসর ঢাকা সমিতি গড়ে উঠবার সুযোগ পায়। ১৯০৭ সালের মধ্যভাগে সরকার পক্ষ সমিতি দমনে এগিয়ে এল; প্রথমত বাধা এল পরোক্ষ ভাবে। ঢাকা শহরে রহমত উল্লা নামে এক গুণ্ডা ছিল। তার দলটি কুখ্যাত ছিল। এই দলের ভয়ে শহরবাসিগণকে সর্বদা সশঙ্ক থাকতে হত। পুলিশ সমিতিকে দমন করবার জন্য প্রথমত তাদেরই কাজে লাগায়। ফলে সমিতিকেও রহমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। ১৯০৭ সালের জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার দিনে রহমতকে হত্যা করা হবে স্থির হয়। কিন্তু শোভাযাত্রায় রহমতকে পাওয়া গেল না। তার সহকারী হাবিবকে হত্যার চেষ্টা হল; কিন্তু ছুরিকাহত হয়েও হাবিব বেঁচে গেল। বিপ্লবীদের পক্ষেও কেহ ধরা পড়ে নাই। পুলিশ হাবিবকে দিয়ে এক মিথ্যা বিবৃতি প্রস্তুত করে এবং দলের বিশিষ্ট কর্মী জ্যোতির্ময় রায়কে গ্রেপ্তার করে। জ্যোতির্ময় রায় ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। এসত্ত্বেও বিচারে আট মাস কারাদণ্ডে

দণ্ডিত হন। দ্বিতীয় দিনে শোভাযাত্রায় রহমতকে দেখা যায়। সমিতির পক্ষ থেকে রহমতকে হত্যার চেষ্টা হল। কিন্তু গোলমালের মধ্যে সে সরে পড়ে। এই ঘটনায় তার আরেকজন সহকারী নিহত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে সমিতির সদস্য খগেন নাগকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান।

এই সময় স্বদেশী আন্দোলন দমন করবার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার নিরক্ষর মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। রহমত উল্লাকে হত্যা করার চেষ্টার কয়েক দিন পরেই পুলিশের প্ররোচনায় গুণ্ডাগণ দলবদ্ধ ভাবে পুলিনবাবুর গৃহ আক্রমণ করে। কিন্তু সমিতির সদস্যগণের নিকট বাধা পায় এবং মার খেয়ে হটে যায়। এই ঘটনার পরেই পুলিশ এসে পুলিনবাবুর এক ভ্রাতা, সমিতির কর্মী রাধিকা গাঙ্গুলী এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। সাড়ম্বরে মামলা আরম্ভ হল সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে সমিতির সদস্যদের পক্ষ সমর্থনের জন্য পি. মিত্র এই সময় ঢাকা যান। সাক্ষ্য প্রমাণও সমিতির সদস্যদের অনুকূলে। পুলিন-বাবুর গৃহই আক্রান্ত হয়েছিল এবং গুণ্ডারাই চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সমিতির সদস্যদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর, মামলা প্রহসন মাত্র। বিচারে প্রায় সকলের শাস্তি হয়। পুলিনবাবু ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

জেল থেকে বাইরে এসে পুলিনবাবু বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে আবার বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতি সম্প্রসারিত হল। প্রিয় মহারাজ শ্রীহট্টের দিকে কয়েকটি শাখা স্থাপন করেন। ভূপেন্দ্র নাথ ময়মনসিংহে সংগঠনের ভার নিয়ে যান। যতীন রায় কুমিল্লা যান এবং যতীন গুপ্তকে বরিশাল পাঠানো হয়।

সমিতির সম্প্রসারণ সম্পর্কে শ্রীনরেন সেন বলেন, ১৯০৭-৮ সালে যতীন গুপ্ত লাঠি খেলা শিখাতে বরিশাল গিয়েছিলেন। প্রিয় মহারাজ, রাধিকা গাঙ্গুলী প্রভৃতি সমিতির শাখা বিস্তার করবার জন্য শ্রীহট্ট অঞ্চলে গিয়েছিলেন। ওলপুরের অতুল রায় চৌধুরী, হেমেন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি সমিতির পরিদর্শক হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। শচীন ব্যানার্জী, শান্তি মুখার্জী প্রভৃতিও পরিদর্শকের কাজ করিতেন। শিশির গুহ এবং শান্তি মুখার্জী অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কলকাতায় যেতেন। তাঁরা কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কলকাতায় তাঁরা ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে উঠতেন।

ঢাকায় ভূতের বাড়ীতে সমিতির গৃহত্যাগী সদস্যগণ থাকতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ দাশগুপ্ত, শান্তি মুখার্জী, সুরেন ঘোষ, মতি সেন, মণি সেন,

শরৎ চ্যাটার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, রাধিকা রায়, রাধিকা গাঙ্গুলী, মাণিক্য গুহ, প্রতাপ বসু নিশি মিত্র, গোপাল সেন, ভূতনাথ সেন প্রভৃতি। এ মিতিতে কিছু মানচিত্র সংগৃহীত হয়েছিল। এগুলি থাকতো দক্ষিণ মৈশণ্ডীর সতীশ চক্রবর্তীর নিকট। সমিতির আবাসিক কেন্দ্রে ঘুম থেকে উঠে সকলকেই দৈনন্দিন কুচ-কাওয়াজে যোগ দিতে হত। তারপর ধ্যান-উপাসনা এবং পরে জলযোগ। এর পরে শুরু হত লাঠি খেলা ও ছোরা খেলা। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পরে পড়া-শুনা এবং প্রবন্ধাদি লেখার সময় নির্দিষ্ট ছিল। বৈকালে আবার লাঠি খেলা এবং কুচকাওয়াজ। রান্না-বান্না, ঘরদোর পরিষ্কার প্রভৃতি সবই নিজেদের করতে হত।

অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় শেখরনগর ডাকাতি দলের প্রথম প্রয়াস। পুলিনবাবু স্বয়ং এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লোহার সিন্দুক ভাঙতে না পারায় অর্থলাভ সামান্যই হয়েছিল। বাহ্রা ডাকাতিই দলের প্রথম বড় রকমের কীর্তি। কলকাতা অনুশীলন সমিতি থেকে অস্ত্রাদি সহ বসন্ত সরকার, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী নামক দুজন সদস্যও এই ডাকাতিতে যোগ দেন। ডাকাতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে যায়; এবং একদল গ্রামবাসী বিপ্লবীদের অনু-সরণ করতে থাকে। পরে পুলিশও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পুলিশ সহ অনুসরণকারীদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরে সংগ্রাম চলে। মধ্যপাড়ানিবাসী গোপাল সেন পুলিশের গুলীতে নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। রাজেন দত্ত বর্শার আঘাতে আহত হন। এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শশী সরকার, রাজেন দত্ত, আশুতোষ দাসগুপ্ত, নরেন সেন, জ্ঞান মজুমদার, শচীন ব্যানার্জী, শান্তি মুখার্জী, গোপাল সেন, সারদা চক্রবর্তী, অমৃত হাজরা, শিশির গুহরায়, শরৎ চ্যাটার্জী, দীনেশ গুহ মুস্তাফী প্রভৃতি। প্রতুল গাঙ্গুলী বলেন, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথও এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতা এবং ঢাকা কেন্দ্রের মিলিত চেষ্টাই এই ডাকাতির বৈশিষ্ট্য।

১৯০৮ সালে সমিতি নিষিদ্ধ হলে ভূতের বাড়ীর বোর্ডিং উঠে যায় এবং কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ২৬ নং কানাই ধর লেনে সমিতির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১২০।৩নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে পুলিনবাবুর ভগ্নীপতির বাসাও মাঝে মাঝে মিলনকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করা হত। সমিতির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' ছাপা হত নোয়াবদি ওস্তাগর লেনে। কানাই ধর লেনে থাকতেন আশুতোষ দাসগুপ্ত, প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, শিশির গুহরায় প্রভৃতি।

১৯০৮ সালে পুলিনবিহারী এবং ভুপেশ নাগ তিন আইনে বন্দী হন। পুলিনবাবুকে মণ্টগোমারী জেলে এবং ভূপেশবাবুকে ডালহৌসী জেলে রাখা হয়।

বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে ভূপেশবাবু আর সমিতির কাজে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন নাই। তিনি এই সময় বহরমপুরে থাকতেন। ভূপেশবাবুর পিতা শম্ভু নাগ ছিলেন সাবজজ। তিনি ঢাকা বারোদি অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

এই সময় সমিতির দারুণ অর্থাভাব। আশুতোষ দাসগুপ্ত ছিলেন সমিতির নেতা। তিনি স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করে অর্থাভাব মেটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। আগরতলায় নূতন মহারাজের রাজ্যাভিষেকে প্রচুর অর্থ দান করা হচ্ছিল। সেখান থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আশুবাবু ও দীনেশ গুহমুস্তাফী এবং শান্তি মুখার্জী আগরতলা যান। এই সময় বাংলার কুখ্যাত লাট সাহেব ফুলারেরও সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু গোয়েন্দা সেখানে সমবেত হয়েছিল। ফলে আগরতলার মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হতেই বিপ্লবী তিনজন গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ মনে করলো তাঁরা লাট হত্যার উদ্দেশ্যেই আগরতলা এসেছেন। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করেও ঐ সম্পর্কে কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পেরে বিপ্লবীদের ত্রিপুরা জেলায় নিয়ে এসে বাংলা পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। কুমিল্লায় তাঁদের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করা হল। একমাত্র দীনেশবাবুর বাড়ী থেকেই জামিনের টাকা দেওয়া হল, তিনি বাইরে এলেন। আশুবাবু এবং শান্তিবাবুকে এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। আশুবাবুর দণ্ডকালের অধিকাংশই আগ্রা জেলে কাটে। তিনি কখনও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নাই। জেল কর্তৃপক্ষকে তিনি বলতেন, ভারতে ইংরেজের অধিকার তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং ইংরেজের কোন আইনও তিনি মানবেন না। দণ্ডকালান্তে বাইরে এসেও তিনি এই মনোভাব ত্যাগ করেন নাই। ১৯৪৫ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৯০৮ সালে সমিতির ব্যয়নির্বাহের জন্য মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করা হয়। মুষ্টিভিক্ষায় সপ্তাহে তিন-চার মণ চাল পাওয়া যেত; কিন্তু এ দিয়েও সমিতির ব্যয় নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়ল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আনন্দমঠের আদর্শই ছিল সমিতিরও আদর্শ। দেশসেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের অর্থ লুণ্ঠন অনুমোদন করেছেন। অনুশীলন সমিতিও সমাজদ্রোহীদের অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করা অনুচিত মনে করেন নি। সমাজদ্রোহীদের শাস্তি হবে এবং তাদের অর্থে দেশের কাজও চলবে। কর্মিগণও বিপদের ঝুঁকি নিতে শিখবে; সাহসিকতা ও সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন হবে।

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্রই তস্করবৃত্তি অনুশীলনের ফল। ইহা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না।" সাম্যবাদের প্রবর্তক কার্ল মার্ক্সও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে অন্যায় বলে অভিহিত করেছেন। এই সকল যুক্তি অবশ্য অনুশীলন সমিতির ঐ সময়কার চিন্তাধারায় ছিল না। মুখ্যত তাঁরা আনন্দমঠের আদর্শ অনুযায়ী দেশসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং পরোক্ষভাবে সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই অর্থ লুণ্ঠনের কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবুও ডাকাতি পরিত্যাগ করে যে অন্যভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয় নাই, তা নয়। প্রথম দিকে ধনীরা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু আলিপুর মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে অনেক ধনী ধরা পড়লেন। ফলে, উৎসাহী অনেক ধনীই ঘর নিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরে কলকাতা অনুশীলন সমিতি কার্যত ভেঙে যাওয়ার এটিও একটা কারণ। কলকাতা সমিতি প্রধানত বড়লোকের দানেই চলত। ডাকাতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহের যে সমস্ত চেষ্টা হয়েছে সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনলিনী কিশোর গুহ তাঁর "বাঙলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন, "১৯১০ সাল হইতেই জাল নোট তৈরী ও তাহার প্রচলন প্রয়াস চলে, সেই চেষ্টা এক আধবার নহে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এই চেষ্টা হয়। কিছুটা সাফল্যও ঘটে, শেষবারের চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল। দশ পনের হাজার টাকা বোধ হয় চলিয়াছিল। শেষে ধরা পড়ে প্রবোধ দাশগুপ্ত এবং অন্য একজন দণ্ডিত হন।"

এ ছাড়া বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম সোনা তৈরী প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করে অর্থসমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়। কলকাতা অনুশীলন সমিতির পণ্ডিত মোক্ষদা সমাধ্যায়ী এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। এ জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয়। তা ১৯১২ সালের কথা। শ্রীমাণী মার্কেটের উপরে বিপ্লবীদের এক গোপন বৈঠকে অঘোর বাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অগ্রসর হয় নাই।

বারীন্দ্রের নেতৃত্বে প্রকাশিত যুগান্তর পত্রিকায় ডাকাতির দ্বারা দেশসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উপদেশ থাকত। ১৯০৯ সালে পুলিনবাবু নির্বাসিত হন। ঢাকা সমিতির গৃহত্যাগী কর্মিগণ প্রায় সকলেই কলিকাতা কেন্দ্র ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে চলে আসেন। পি. মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে ডাকাতি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সতীশবাবু ডাকাতির পন্থায় বিশেষ ভাবে আপত্তি করেন। পি. মিত্র সতীশবাবুকে সমর্থন করেন। ঢাকা সমিতির সদস্যদের মধ্যে শিশির

গুহরায়, শান্তি মুখার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এ্যালেন সাহেবকে গুলী করে শিশিরবাবু তখন ফেরার। তাঁকে এবং ঢাকা সমিতির অন্যান্য গৃহত্যাগী কর্মীদের রক্ষার জন্য আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাই পি. মিত্র একটি মাত্র ডাকাতির অনুমতি দিলেন।

১৯৪৯ সালের স্বাধীনতা সংখ্যা যুগান্তর পত্রিকায় পুলিনবাবু ডাকাতি সম্পর্কে এক বিবরণ দিয়েছেন। "১৯০৬-১৯০৭ সালে একদিন প্রাতে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে সমিতির বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক গুপ্ত সভা বসিল। পি. মিত্র সভাপতি হইলেন। গুপ্ত সমিতির পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ডাকাতির কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিল দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া সরকারী টাকাই লুঠ করা সঙ্গত। কেহ বলিল, গভর্মেন্টের টাকা লুঠ করিতে যে শক্তি প্রয়োজন সে শক্তি সঞ্চয় করিতে যে অর্থের প্রয়োজন ডাকাতি না করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না। পরে শ্রীঅরবিন্দ বুঝাইলেন যে স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করিতে যে নীতিগত দোষ কল্পনা করা হয় তাহা অমূলক। শেষ পর্যন্ত রঙপুরের একজন প্রতিনিধি বলিলেন, আমরা ডাকাতি করিয়া যে অর্থ আনিব তাহার একটি সঠিক হিসাব রাখিব এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঐ সমস্ত লোককে ফিরাইয়া দিব। শ্রীঅরবিন্দ ইহা সমর্থন করিলেন এবং এই প্রস্তাবটিই গৃহীত হইল।"

পূর্বেই বলেছি, ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রচার-বিরোধী ছিল। এ বিষয়ে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের মতের অনুরূপ। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ এক-দল তরুণ বিপ্লবী ছিলেন প্রচারধর্মী। প্রচারের মধ্য থেকে কর্মী সংগৃহীত হোক এটাই তাঁরা চাইতেন। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলালের একটা বিবৃতি আছে। তাতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তি যুগান্তর পাঠে আকৃষ্ট হয়ে যুগান্তর অফিসে এসে দলভুক্ত হয়েছিল। যুগান্তরের প্রচার পরোক্ষভাবে যে দল গঠনে সাহায্য করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯০৭ সালের ১৮ই এপ্রিলের যুগান্তর পত্রিকায় ছিল, "অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিতেই হইবে। আমরা আহ্বান করি সেই অশান্তিকে যার নাম বিদ্রোহ।" এই সালেরই ১২ই আগষ্টের পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ছিল, "দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়। আর বোমা তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু গোপনতা অবলম্বন করিতে হইবে।" এইরূপ খোলাখুলি প্রচারের ফলে ভাবপ্রবণ যুবক ও ছাত্র সমাজের উপর যুগান্তরের প্রভাব পড়ে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে এক জোয়ার এনে দেয়। ঢাকা সমিতি যে এর সুযোগ গ্রহণ করে নাই

তা নয়। তা না হলে এতবড় সংগঠন এত দ্রুত সৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষেও হয়ত সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষভাবে ঢাকা সমিতির এই সময় কোন প্রচারপত্র ছিল না। প্রচারপত্রের সাহায্য গ্রহণ করা তাঁরা নীতিবিরুদ্ধ মনে করতেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা দল গঠিত বলে ঢাকা সমিতি ছিল অধিকতর সুসংহত এবং সুগঠিত।

তৃতীয় অধ্যায়

এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ

১৯০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। এই দিন এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপ্লবী বাংলা আত্মপ্রকাশ করল। এর আগে শিলঙ্-এ ফুলার হত্যার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন বারীন্দ্রকুমার এবং অন্য একজন বিপ্লবী। ফুলার হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। বিপ্লবীরা শিলঙ্-এ প্রায় এক মাস থেকেও লাটসাহেবকে স্পর্শ করতে পারেন নাই। তারপরে শিলঙ্ থেকে বরিশাল, বরিশাল থেকে রংপুর, রংপুর থেকে গোয়ালন্দ এবং গোযালন্দ থেকে কলকাতা ফুলারের পেছনে পেছনে ছুটেও বিপ্লবীরা তাঁকে ধরতে পারেন নাই। এজন্য এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টাই বিপ্লবী বাংলার প্রথম প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত।

ঢাকাতে সমিতির কার্যকলাপ দেখে ম্যাজি‌স্ট্রেট এ্যালেন সমিতিকে দমন করবার জন্য তৎপর হন। তিনি নানাভাবে সমিতির কাজে বাধা দিতে থাকেন। এজন্য সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত হয়। শিশির গুহরায়, শচীন ব্যানার্জী এবং সত্যেন বসুকে এজন্য নিযুক্ত করা হয়। এ সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ বলেন, "একদিন রাত্রি ৯টা-১০টার সময় পুলিনবাবু তাঁর বাসায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে উপস্থিত হতে বললেন, আগামীকাল ১০টায় গোয়ালন্দ মেলে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ্যালেন যাবেন, তাঁকে পথে যে কোন স্থানে হত্যা করতে হবে। রাত্রিতে পরামর্শ করে তিনজনেই প্রস্তুত হও।" রাত্রিতে তিন বিপ্লবী একসঙ্গেই শয়ন করলেন। সকাল হতে তিনজনেই স্বামীবাগ গিয়ে পুকুরে স্নান করে স্বামীজীর প্রসাদীয় ফুল, বেলপাতা নিলেন। স্বামীজী তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। সেদিন পুলিনবাবুর গৃহেই বিপ্লবীদের খাওয়ার ব্যবস্থা হল। ভাত দিয়েই পুলিনবাবু এক বাটি গরম ঘি নিয়ে এসে বিপ্লবীদের থালায় থালায় ঢেলে দিলেন। বললেন, "ঘি পেটে থাকলে দু-তিন দিন না খেয়েও থাকা যায়।" এর পরে পঞ্চাশটি টাকা হাতে দিয়ে বললেন, "আর নেই। এই তোমাদের পাথেয়। নিরুপায় হলে মৃত্যুবরণ কোরো, ধরা দিও না।" ঢাকা ষ্টেশনে এসে বিপ্লবীরা এ্যালেন সাহেবকে দেখতে পেলেন। গায়ে ছোট ছোট ডোরাকাটা সোনালী রং'এর ওয়েষ্ট কোট, এই নিশানাই পুলিনবাবু বলে দিয়েছিলেন। ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ এসে বিপ্লবীরা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠলেন।

গোয়ালন্দ ষ্টেশনে এসে ষ্টীমার থামল। লাটসাহেব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তিনি আগেই নেমে গেলেন। তৃতীয় শ্রেণীর সিঁড়ি তৈরীতে কিছু সময় লাগল। সিঁড়ি তৈরী হতে না হতেই বিপ্লবীরা ট্রেনের দিকে ছুটে গেলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন সাহেব গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরে ভেতরে ঢুকছেন। শিশিরবাবু দৌড়ে গিয়ে রিভলভার গায়ে ঠেকিয়েই গুলী করলেন। সাহেব উপুড় হয়ে গাড়ীর মধ্যে পড়ে গেলেন। শচীনবাবু এবং সত্যেনবাবু, এঁরাও গিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে মিলিত হলেন। সাহেব মরে গেছে মনে করে তাঁরা আর ওখানে দাঁড়ান যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। চারদিকে হৈচৈ হচ্ছিল। একদল লোক পেছন থেকে বিপ্লবীদের অনুসরণ করছিল। বিপ্লবীরা পিছন ফিরে তাকিয়ে গুলী করে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন। এর পরে তাঁরা রাত্রির অন্ধকারে রেললাইন ধরে চলতে লাগলেন। শিশিরবাবু পথঘাট কিছুটা জানতেন। তিনজনে পায়ে হেঁটে ফরিদপুর টাউনের দিকে রওনা হলেন।

শীতের রাত্রি, তিনজনেরই খালি পা, গায়ে সামান্য জামা, পদ্মা নদীর পার ধরে চলতে লাগলেন। পথে কোথাও কাদা, কোথাও জল, কোথাও গভীর বালি। এইভাবেই তিন-চার মাইল চলে বিপ্লবীরা সামনে একটি জলা পেলেন। জলার পার ধরে তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে দেখলেন কয়েকখানা নৌকা বাঁধা আছে। বেদেদের নৌকা, বেদেরা ভিতরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বিপ্লবীরা উঠে নৌকা খুলে দিয়ে চালাতে লাগলেন। একটু পরেই বেদেরা উঠে পড়ল এবং হৈচৈ আরম্ভ করল। কিন্তু বিপ্লবীরা তীরে নেমে পড়লেন এবং অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিলেন। এইভাবে চলে তাঁরা শেষ রাত্রিতে খেয়াঘাটে পৌঁছুলেন। পাটনি উঠবার আগেই তাঁরা খেয়া নৌকায় পার হলেন। বিপ্লবীরা কোন যানবাহনে উঠবার কোন চেষ্টা করলেন না। তাঁরা মেঠো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে তিনটার সময় লৌহজং পৌঁছুলেন। এখানকার জমিদার পালবাবুদের বাড়ীর এক যুবক বিপ্লবীদের পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীরা ঐ বাড়ীতে গিয়ে ভাত খেলেন। ইতিমধ্যে সাহেব মারার সংবাদ সর্বত্র রটে গিয়েছে। রাত্রিতে স্বর্ণগ্রামে শচীনবাবুর মামার বাড়ী পৌঁছুলেন। পরদিন সকালে শিশির ও সত্যেন অস্ত্রশস্ত্র বাড়ীতে রেখে ভদ্রবেশে ঢাকার দিকে চলে গেলেন। শচীনবাবু রাত্রির অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে শুনলেন পূর্ব রাত্রিতে দারোগা এসে বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাসী করেছে। তাই বুঝলেন বাড়ীতে থাকাও চলবে না। শেষ রাত্রিতে উঠে মাকে প্রণাম করে সোজা কলকাতা চলে এলেন এবং ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে কেন্দ্রীয় সমিতির

অফিসে এসে উঠলেন। পরদিন কলকাতা সমিতির একজন সভ্য শচীনবাবুকে এ্যালেন হত্যার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাখানি দেখালেন। পত্রিকায় হেড লাইন দিয়েছে, "লাউ কুমড়া বাদ গেল সৈরসার মধ্যি ত্যাল।" শচীনবাবু বলেন, কলকাতার সভ্যরা আমাদের ভাইয়ের মত ভালবাসত। পত্রিকায় লেখা ছিল, তিনজন যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করেছে। দুইজন ছিল খালি পা, আর এক-জনের পায়ে বুটজুতা ছিল। সরকার স্পেশাল ট্রেনে এ্যালেন সাহেবকে কলকাতায় এনেছে। সাহেব বেঁচে আছে কি মরে গেছে এ বিষয়ে কিছুই লেখা হয়নি। পরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় এই ঘটনার কোন উল্লেখ করা হয়নি।

অনুশীলন সমিতির পরবর্তী বিপ্লবী প্রচেষ্টা বাহ্রা ডাকাতি। ১৯০৮ সালের ২রা জুন খুব ভোরে ঢাকা থেকে দুখানি নৌকা ছাড়ল। বিভিন্ন স্থান থেকে ৩১ জন বিপ্লবী নৌকায় উঠলেন। বিপ্লবীরাই নৌকার দাঁড়ি-মাঝি। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে নতুন ধরনের দূরপাল্লার রাইফেল, প্রচুর পরিমাণ কার্তুজ এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি। ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন পুলিনবিহারী স্বয়ং। যে বাড়ীতে ডাকাতি হবে তার ম্যাপ, নিকটবর্তী রাস্তা, নদী প্রভৃতিও এঁকে দিয়ে-ছিলেন; সশস্ত্র রক্ষী কোথায় কোথায় দাঁড়াবে তাহাও ম্যাপে চিহ্নিত ছিল। রাত্রি আটটার সময় নৌকা বাহ্রা পৌছুল। বিপ্লবীরা বাড়ী বেষ্টন করে অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ করতে লাগলেন। বাড়ীর মালিক ভয় পেয়ে সিন্দুকের চাবি বিপ্লবীদের হাতে দিলেন। ডাকাতি সহজেই সফল হল। বিপ্লবীরা ফিরে চললেন। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা বর্শা রাজেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে এসে বিদ্ধ হল। বিপ্লবীরা বুঝলেন তাঁরা আক্রান্ত। তাঁরা অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই ভাবে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে তাঁরা নৌকায় উঠলেন। কিন্তু নদীর দুই পার ধরে গ্রামবাসীরা তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। ততক্ষণে সকাল হয়েছে। থানার দারোগা এসে বহু পুলিশ সহ অনুসরণকারীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বিপ্লবীরা তাঁদের নৌকার গতিমুখ ফিরিয়ে দিলেন। নৌকা বড় নদী ছেড়ে একটি ছোট নদীতে এসে প্রবেশ করল। তীর থেকে পুলিশ গুলী করছিল এবং বিপ্লবীরাও নৌকা থেকে গুলী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ পুলিশের একটা গুলী এসে গোপাল সেনের মস্তকে বিদ্ধ হল। গোপাল 'বন্দেমাতরম্' বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃতদেহ ইট বেঁধে নদীগর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হল। এই আত্মবলিদান বিপ্লবীদের মনে এক নূতন প্রেরণা এনে দিল। তাঁরা সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন "বন্দেমাতরম্"। জনতার এক অংশও এই ধ্বনিতে সাড়া দিল। বিপ্লবীরা এবার গুলীবর্ষণ বন্ধ করলেন। দেখা গেল জনতাও ক্রমে কমে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তখনও বিপ্লবীদের

অনুসরণ করছিল। তখন সূর্যাস্তের পর রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ ঈশান কোণে এক খণ্ড মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কালবৈশাখীর ঝড় আরম্ভ হল। এবার নৌকার পাল লাগিয়ে যেদিকে ঝড় বইছিল সেই দিকে মুখ করে দেওয়া হল। ঝড়ের বেগে তীব্র গতিতে নৌকা ছুটল। পুলিশ কিংবা অনুসরণকারীরা কেউ বুঝতে পারল না নৌকা কোনদিকে গেল। শেষ রাত্রিতে এক স্থানে পেঁ ৗছে বিপ্লবীরা তীরে উঠলেন। ক্রমে তৃতীয় দিনের প্রভাত হল। অর্থ এবং অস্ত্রাদি কোথায় যাবে এ সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা করতে হল। বিপ্লবীরা নেতার নির্দেশ নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন।

বাহ্রা ডাকাতি কাদের কাজ পুলিশ অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারে নি। বাহ্রা ডাকাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ ঘটনা কলকাতা ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির মিলিত অভিযান। এ সম্পর্কে কলকাতা অনুশীলন সমিতির বসন্তকুমার সরকার বলেন, “এ বৎসর ২রা জুন রাত্রিতে ঢাকার বাহ্রা বাজার ঢাকা অনুশীলন ও কলকাতা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক যুক্তভাবে লুণ্ঠিত হয়। কলকাতা অনুশীলন হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যাইবার ভার আমার উপর পড়ে। বাঁকুড়ার মুন্সেফের পুত্র শৈলেন চক্রবর্তী আমার সঙ্গী হইল। ১লা জুন ইডেন হষ্টেল হইতে শিয়ালদহে রাত্রির ট্রেন ধরিলাম। সঙ্গে একটি ট্রাঙ্কে Winchester Rifleটি, কতগুলি রিভলভার ও ঢাকা সমিতির কয়েকটি পিস্তল এবং অন্যান্য অস্ত্র ছিল। ভোরে গোয়ালন্দে নামিলাম। নির্দেশ মত লোক ছিল, নির্ধারিত সময়ে একটি ছিপে উঠিলাম। বাহ্রা বাজারের নিকট আসিবার পূর্বে পূর্ব ব্যবস্থামত পঞ্চাশ ষাট জন লোক নৌকাতে উঠিল। মুসলমানরা “আল্লা হো আকবর” ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং হাতে লাঠি-সোটা আছে। আমি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রাইফেল চালাইলাম। গুলীর শব্দে তাহারা পিছাইয়া গেল। কিন্তু পুনরায় আরও হিংস্রভাবে দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মত্তের মত আক্রমণ করিতে লাগিল। আবার গুলী ছুড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্টা সংগ্রামের পর তাহারা সরিয়া পড়িল। আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে একদল নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়াছিল। এবার তাহারা নৌকায় ফিরিয়া আসিলে আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। জনতা তাদের অনুসরণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ আমাদের ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে না পারিয়া তাহারাও সরিয়া পড়িল। আমি ও শৈলেন

চক্রবর্তী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। (অগ্নিযুগের স্মৃতিকথা)

বসন্তবাবু কলকাতা অনুশীলন এবং ঢাকা অনুশীলনের মিলিত প্রচেষ্টার আরও কিছু বিবরণ দিয়েছেন। "১৯০৭ সালের মে মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসের জন্য পটুয়াটোলা লেনে বাসা ভাড়া করিলাম।**** আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহে অর্থের অভাব দেখা দিল। ১৯০৮ সালে পটুয়াটোলা লেনে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পাশের ঘরে জাল টাকা ও কার্টিজ তৈরী করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র লেদ্ মেসিন ও কিছু যন্ত্রপাতি বসান হইল। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তখন টাঁকশালে কাজ করিতেন। তাঁহার সাহায্যে তথা হইতে একজন মিস্ত্রী সংগ্রহ করা হইল। এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টার একজন পলাতক আসামী আমার বন্ধু পরিচয়ে আমাদের গড়বেতার বাড়ীতে ছয় মাস ছিলেন। তাঁহাকে আমরা নলিনী সরকার বলিয়া জানিতাম। পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় দেশী রিভলভার, বন্দুক প্রভৃতি তৈরীর জন্য একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনে অম্বিকা নগরের রাজার খুব সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।"

এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টার পরে শিশিরবাবু দীর্ঘদিন ফেরার ছিলেন। তাঁকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। ১৯১৪ সালে কলকাতার এক মেসে তিনি গ্রেপ্তার হন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে ঐ মেসে তখন বিপ্লবী মদন ভৌমিক অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। শিশিরবাবু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে ১০৯ ধারায় দণ্ডিত করে। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে মদন ভৌমিক, নলিনী গুহ, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এবং গোপাল রায়কেও দণ্ডিত করা হয়। জেল থেকে বাইরে এসে শিশিরবাবু স্বগ্রাম ভাঙ্গাতে অন্তরীণ হন। তাঁর পরিবারে তখন আর কেউ নাই। ঐ স্থানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিনা চিকিৎসায় মারা যান। একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবীর এই পরিণতি মর্মান্তিক। কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে কত লোকের ভাগ্যে যে এরূপ ঘটেছে কে তার হিসাব রাখে।

এই সময় অমৃত হাজরা, আশু দাসগুপ্ত, বীরেন চ্যাটার্জী, শচীন ব্যানার্জী এবং রাজেন দত্ত প্রভৃতি কেন্দ্রীয় অফিস ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে যাতায়াত করতেন। পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের মধ্যে তখন ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), সতীশ বসু, শরৎ ঘোষ প্রভৃতি।

১৯০৮ সালে পুলিনবাবুর গ্রেপ্তারের পর আশুতোষ দাসগুপ্ত পূর্ববঙ্গ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসও এ সময় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা সমিতির কর্মীরা ২৬নং কানাই ধর লেনে, শ্যামবাজারে

একটি বাড়ীতে এবং ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে অবস্থান করতেন। ঢাকেশ্বরী মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রজনী বসাক সমিতির বিশেষ সহায়ক ছিলেন। পি. মিত্রের অনুমতি নিয়ে এই সময় রাজানগর ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতি সংক্রান্ত তথ্যাদি রজনীবাবুই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলা এবং আদাবাড়ী অস্ত্র আইনের মামলা এই সময়ে উল্লেখযোগ্য। মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় দণ্ডিত ললিত চৌধুরী জেলখানায়ই মারা যান। আদাবাড়ী অস্ত্র আইনের মামলায় দণ্ডিত অবনী গাঙ্গুলীকে পরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

১৯০৯ সালের শেষ দিকে আশুতোষ দাসগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। তখন দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন মাখন সেন। কলকাতায় পড়াশুনা করার সময় তিনি কলকাতা অনুশীলনের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত হন। ঢাকায় এসে তিনি সোনারং ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঢাকা সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকেন। বিপ্লবের ইতিহাসে সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকা সমিতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে রমেশ আচার্য, রবি সেন প্রভৃতি এখানে শিক্ষকতা করতেন। দলের বরিশাল শাখার প্রতিষ্ঠাতা যতীন রায় (ফেগু রায়) এবং অন্যান্য কয়েকজন এখানে ছাত্ররূপে ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক একদল মুসলমানের সঙ্গে সংঘর্ষের একটি ঘটনাকে পুলিশ ডাকলুঠ বলে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এই সম্পর্কে পুলিশ প্রায় পনেরজন ছাত্র ও শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা অনেকেই অল্পবিস্তর দণ্ডিত হন। ফলে সোনারং কেন্দ্র তুলে দিতে হয়।

মাখনবাবু নেতৃত্ব গ্রহণ করে দলের পূর্ব নীতি কিছুটা পরিবর্তন করতে চান। তিনি বলেন, ডাকাতি একেবারেই বন্ধ করতে হবে এবং সেবাধর্মই হবে সমিতির কাজ। কিন্তু নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেরই এটা মনঃপূত হল না। তাঁরা সমিতির বৈপ্লবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মেনে নিতে পারলেন না। এঁদের সঙ্গে একমত হতে না পেরে মাখনবাবু সমিতি ত্যাগ করলেন।

সোনারং ডাকলুঠের সময় একজন পিওন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। তাকে পরে হত্যা করা হয়। রাউতভোগে এক মাচার উপর কিছু বুলেট ছিল। দুই ব্যক্তি তা ধরিয়ে দেয়। দলের পক্ষ থেকে তাদের শাস্তিবিধানের ফলে হত্যা করা হয়। ময়মনসিংহে পুলিশ ইনস্পেক্টর রাজকুমার রায়কে এই সালেই হত্যা করা হয়। সতীশ দাসগুপ্ত, মহারাজ এবং অন্য এক ব্যক্তি এই জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সতীশ দাসগুপ্ত পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন এবং স্বামী সত্যানন্দ নামে পরিচিত

হন। এর কিছুদিন পরে ঢাকার পুলিশ ইনস্পেক্টর শরৎ ঘোষকে হত্যার চেষ্টা হয়। নরেন সেন, রাজেন দত্ত এবং সতীশ দাসগুপ্ত এই কার্যের জন্য নিযুক্ত হন। শরৎ ঘোষ আহত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান। আততায়ী বলে সে হিরণ্ময় গুপ্ত এবং নৃপেন চক্রবর্তীর নাম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কেউই ছিলেন না। মামলায় তাঁরা মুক্তি পান। ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসব চলছিল ঐদিন সরকারী শোভাযাত্রার মধ্যে পুলিশ-বেষ্টিত ইনস্পেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারী ছিলেন মহারাজ, বীরেন চ্যাটার্জী এবং অন্য একজন। ঐ ঘটনায় কেউই ধরা পড়ে নাই। সমিতির পক্ষ থেকে যে কেবল মাত্র পুলিশ হত্যা হয়েছে তা নয়। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতিও সমিতির লক্ষ্য ছিল। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মহান্ত জ্যোতিরিন্দ্র বলের আচরণ সম্পর্কে নানাপ্রকার অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল। নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের পর সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সদস্য চন্দ্রশেখর দে এবং মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ১৯১২ সালের ৬ই আগষ্ট তাঁকে হত্যা করেন।

১৯১২ সালে সমিতি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সমগ্র পূর্ববঙ্গে, আসামের বিভিন্ন স্থানে এবং কলকাতায়ও তাঁদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টা এই সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আই. সি. এস্ গর্ডন ছিলেন মৌলবী বাজারে এস. ডি. ও.। ঐ সময় শ্রীহট্টে অরুণাচল আশ্রমে গিয়ে তিনি বর্ণনাতীত অত্যাচার করেন। ঐ সময়ে পুলিশের গুলীতে মহেন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তি নিহত হন। মহেন্দ্রবাবু ছিলেন কোন এক কলেজের অধ্যাপক। গর্ডন আশ্রমে স্ত্রীলোকদের উপরেও অত্যাচার করে। সমিতি জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে গর্ডনকে শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত করে। বোমা এবং রিভলভার নিয়ে যোগীন্দ্র চক্রবর্তী, অমৃত সরকার এবং তারাপ্রসন্ন বল মৌলবী বাজার যান। বাদুড়বাগান বস্তিতে বসে রাসবিহারী বসু বোমাটি যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বোমাটি বিদীর্ণ হয় এবং ঐ দুর্ঘটনায় যোগীন্দ্রবাবু নিহত হন। অপর দুইজন ঢাকায় ফিরে আসেন। এরপরে গর্ডনকে সুদূর লাহোরে স্থানান্তরিত করা হয়। সমিতির নেতৃত্বভার তখন রাসবিহারী অনেকটা গ্রহণ করেছেন। P. M. বা Political Murder কোথায় হবে তিনিই স্থির করে দিতেন। তাঁরই উদ্যোগে লাহোরে শালিমার গার্ডেনে গর্ডনকে হত্যা করার দ্বিতীয় চেষ্টা করা হয়। বসন্ত বিশ্বাসকে এই কার্যের জন্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু গর্ডন ঐ গার্ডেনে যাইবার আগেই বাগানের মালি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারায়।

এই সময় গোয়েন্দা পুলিস রতিলাল রায় বিশিষ্ট বিপ্লবীদের উপর নজর রাখত। এ জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় তাকে হত্যা করা হয়। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বারেন চ্যাটার্জী এবং প্রতুল গাঙ্গুলীর উপর এই কার্যের ভার ছিল। হত্যাকারিগণ ঘটনাস্থলে কেউই ধরা পড়েন নাই। কিন্তু মহারাজ পরদিন ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁকে ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। এই সালে কুমিল্লাতে ডাকাতি করতে গিয়ে সমিতির কয়েকজন ধরা পড়েন। তাঁদের সংখ্যা দশ-বারো জন। মামলায় সকলেই দণ্ডিত হন। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে রমেশ ব্যানার্জী ১৯২৬ সালে মুসলমান দাঙ্গাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে পুলিসের গুলীতে নিহত হন। ১৯১৩ সালে ঢাকাতে বসন্ত ভট্টাচার্যকে হত্যা করা হয়। বসন্ত সমিতিরই সদস্য ছিল। কিন্তু পুলিসের প্ররোচনায় সে প্রলোভনে পড়ে সমিতির বিরুদ্ধে পুলিসকে সংবাদ দিতে আরম্ভ করে। এই হত্যা-কার্য সম্পর্কে কেউ গ্রেপ্তার হয় নাই। তবে নলিনী ঘোষের নামে ওয়ারেন্ট ছিল। তিনি ফেরার হন। শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র নামে একজন আই. বি. ডি. এস. পি. দলের বিরুদ্ধে কাজ করে দলের ক্ষতি করছিলেন। এ জন্য তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই কার্যের ভার পড়ে অমৃত হাজরা এবং নরেন সরকারের উপর। নরেন বাবু ছিলেন চন্দননগর বিপ্লবী সমিতির সদস্য। কিন্তু এই দলের সহিত পূর্বেই পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মহাপাত্রকে হত্যা করার স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু সময়মত তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায় নাই। ফলে মহাপাত্র মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান।

১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষকে হত্যা করা হয়। নৃপেনবাবু প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় শোভাবাজারে যেতেন। চিৎপুর রোডের মোড়ে তাঁকে হত্যা করা স্থির হয়। নির্মল রায়, খগেন চৌধুরী এবং প্রিয়নাথ ব্যানার্জীর উপর এই কার্যের ভার পড়ে। কাজ শেষ করে খগেন বাবু ও প্রিয়নাথ বাবু সরে পড়েন। কিন্তু কয়েকজন লোক নির্মল রায়কে অনুসরণ করে। তিনি বাধ্য হয়ে তাদের দিকে গুলী করেন। গঙ্গা তেলী নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত নির্মলবাবু ধরা পড়েন। রাজভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান করে গ্রেপ্তারকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। ব্যারিষ্টার মিষ্টার নর্টন নির্মল রায়ের পক্ষ সমর্থন করবেন প্রস্তাব করে পাঠান। চিত্তরঞ্জন দাস এবং মিঃ জে. এন. রায়ও আসামী পক্ষে ছিলেন। দুই-দুই বার বিচারেও জুরিগণ আসামীকে নির্দোষ বলেন, ফলে নির্মলবাবু মুক্তি পান। এর কিছুদিন পরে চট্টগ্রামে সত্যেন সেনকে হত্যা করা হয়। সত্যেন পুলিশের চর ছিল। কিন্তু

হত্যার লক্ষ্য সে ছিল না। মহারাজের নামে নৌকা চুরির এক মিথ্যা মামলা হয়েছিল। এক পুলিশের চর এ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দেয়। সে চট্টগ্রামে আছে জেনে সামতি থেকে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়। সত্যেন সেন ঐ সময় তার সঙ্গে ছিল। সুতরাং বিপ্লবীর গুলীতে সে-ই নিহত হয়। এ সম্পর্কে আদিত্য দত্তের নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। কিন্তু তিনি ফেরার হন। পূজার ছুটির কিছু আগে কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা পুলিশ হরিপদ দেবকে হত্যা করা হয়। হরিপদ গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষের সহকারী ছিল। প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, অমৃত হাজরা এবং নির্মল রায়কে এজন্য নিযুক্ত করা হয়। ময়মনসিংহের বঙ্কিম চৌধুরীকেও এই সময় বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে সে ঢাকা কোতোয়ালীর দারোগা ছিল। মামলা পরিচালনায় সে সাহায্য করে। কেষ্ট সাহা এবং অমৃত সরকার তাকে হত্যা করেন।

পূর্ববঙ্গ দলের সঙ্গে এই সময় সরকারের একটা পরোক্ষ সংগ্রাম চলছিল। অন্যদিকে সমগ্র ভারতে তাদের দল বিস্তার লাভ করছিল। পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে 'লিবার্টি' নামক কাগজ পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল। গোপনে প্রকাশিত এই পত্রিকা একই দিনে লাহোর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিলি হত। অনুশীলন সমিতির উভয় সংগঠনের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হয় যে, সেবাকার্য এবং সংগ্রাম—উভয়বিধ কর্মসূচী একসঙ্গে চলবে এবং সর্বপ্রকার উদ্যোগে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। এইভাবে কিছুদিন কাজ চলে। এবং এর ফলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ: নিবিড়তর হয়। ইংরেজী 'লিবার্টি' এবং বাংলা 'স্বাধীন ভারত' ইস্তাহার মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। এই সকল ইস্তাহারে জনসাধারণের নিকট আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত দেওয়া হত এবং এজন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানানো হত।

অনুশীলনের বিপ্লব আন্দোলন কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় নাই। কর্মীদের দেশাত্মবোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাই নেতাদের অবর্তমানেও এ আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। কর্মী আপন অন্তরলোক থেকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেয়েছেন। তাই সমিতি বার বার আঘাত খেয়েও নবনেতৃত্বে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবীর দৃষ্টির সামনে আলো কখনো নিভে যায় না। নিজের চলার পথ কর্মী নিজেই সৃষ্টি করে নেন। কর্মীরা চিনেছিলেন দেশকে। তাই দেশই তাঁদের পথ দেখিয়েছে। তাঁদের কাছে নেতার আসন ছিল দেশের নীচে। ১৯০৯ সালে পুলিনবাবু নির্বাসনে, সহকারী ভূপেশ নাগও নির্বাসনে। কিন্তু সমিতির কাজ

বন্ধ হয় নাই। ১৪ মাস নির্বাসনে থেকে তিনি ফিরে এলেন ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আবার গ্রেপ্তার হলেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় জুলাই মাসে। কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র মামলা করে বিপ্লবী সংগঠন ভেঙ্গে দিতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের প্রচেষ্টা। এর পরে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা, রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলায়ও একই কৌশল দেখা গেছে। কিন্তু নবনেতৃত্ব সৃষ্টি হতে সময় লাগে নাই। ১৯১৫ সালের শেষ দিকে অনুশীলনের ভাঙ্গা হাটে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন নলিনী ঘোষ। দুদিন আগেও তিনি ছিলেন অনেকের কাছে অপরিচিত। পরে তিনিই পরিচালনা করেছেন শুধু বাংলা সংগঠন নয়, সর্বভারতীয় সংগঠন। তাঁর সহকারী হলেন মারাঠী তরুণ বিনায়ক রাও কাপলে। নেতা হিসাবে সর্বত্র তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। নলিনীবাবু জব্বলপুরে গিয়ে একখানি চিঠি লিখলেন এলাহাবাদে। কোর্টের হাবিলদার রঘুবীর সিং-এর ঠিকানায় চিঠি যায়। কিন্তু দুই একদিন আগেই রঘুবীর গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছুতেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কলকাতা দালান্দা হাউসে এনে তাঁকে আটক করা হল। কিন্তু বিপ্লবীকে বন্দী রাখা চলল না। একদিন বেড়াবার সময় অপর এক বন্দী প্রবোধ বিশ্বাসকে নিয়ে তিনি প্রহরীকে সরকারী কর্মচারী পরিচয় দিয়ে বাইরে চলে এলেন। এরপরে দুজনে এলেন চন্দননগরে। তারপরে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গৌহাটিতে অনুশীলনের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে এসে উঠলেন। এখানে ছিলেন নলিনী বাগচী, সতীশ পাকড়াশী, কৃষ্ণলাল সাহা, প্রভাস লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায়, নরেন ব্যানার্জী, প্রবোধ দাশগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন বল, তারিণী মজুমদার, অমৃত সরকার, নিকুঞ্জ পাল, গোবিন্দ কর প্রভৃতি। এর কিছুদিন আগেই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করা হয়েছে ১৯১৬ সালের ৩০শে জুন। বসন্তবাবু কলকাতায় ভবানীপুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট ধরে সন্ধ্যার সময় সাইকেল করে নিজগৃহ ৫২/২, হরিশ মুখার্জী ষ্ট্রীটে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে প্রহরীরা ছিল। সঙ্গে যাচ্ছিলেন দারোগা বিলাস ঘোষও। বসন্তবাবু বিপ্লবীর গুলীতে আহত হয়ে ধরাশায়ী হলেন। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল বিপ্লবীরা তাঁকে ছেড়ে আসেননি। বিপ্লবীরা ছিলেন পাঁচজন—সুরেশ চক্রবর্তী, অতীন রায়, শিশির ঘোষ এবং আরও দুইজন। জুন মাসের প্রথম দিকেই বিপ্লবীরা এই হত্যার উদ্দেশ্যে এলগিন রোডে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। এখানে থেকে তাঁরা বসন্তবাবুর গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। ঘটনার পরে তাঁরা এলগিন রোডের ঘরে গিয়ে পরিচ্ছদ পরিবর্তন

করে অন্যত্র সরে পড়েন। বসন্ত চ্যাটার্জী বহুদিন ধরেই সমিতির বিশেষ ক্ষতি করে আসছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমিতির পেছনে লেগেছিলেন। এজন্য বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠেন। বসন্তবাবুকে হত্যা করার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯১৪ সালের ১৯শে জুলাই। ঐ সময় তিনি গুপ্তচর উমেশ দের সঙ্গে ঢাকায় বাকল্যাণ্ড বাঁধ ধরে যাচ্ছিলেন। উমেশ দে নিহত হয়, কিন্তু বসন্তবাবু বুড়িগঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করেন। বসন্তবাবুকে হত্যার দ্বিতীয় চেষ্টা হয় ১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর মুসলমান পাড়া লেনে। তিনি ঐ সময় ১০।৭।৩ মুসলমান পাড়া লেনে বাস করছিলেন। বোমার আঘাতে তাঁর দেহরক্ষী রামবচন সিং নিহত হয়। প্রহরী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সোমেশ্বর দত্ত এবং হরবিলাস ঘোষাল গুরুতর ভাবে আহত হয়। বসন্তবাবু অল্পের জন্য রক্ষা পান।

তিনবার চেষ্টা করে বিপ্লবীরা ভারত সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারীকে হত্যা করল, সরকার তাঁকে রক্ষা করার কোনরূপ ব্যবস্থা করতে পারল না, এ নিয়ে দেশে এবং ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সরকারের অক্ষমতা সম্পর্কে নানারূপ সমালোচনা হতে লাগল। এছাড়া ১৯১৫।১৬ সালে নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্ডগুলি বাংলা দেশে অনুষ্ঠিত হয় :—

(১) ১৯১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জি, (২) ২১শে অক্টোবর মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে দারোগা গিরীন্দ্র ব্যানার্জী, (৩) ৩০শে নভেম্বর সারপেণ্টাইন লেনে জনৈক কনেষ্টবল, (৪) ১৯১৬ সালের ৩রা মার্চ কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শরৎচন্দ্র বসু—তিনি ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিসে সংবাদ দিতেন, (৫) ১৯শে অক্টোবর ময়মনসিংহ শহরে পুলিসের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্র মোহন ঘোষ, (৬) ১৯১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে সাব-ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য নিহত হন। এ ছাড়া ঢাকাতে ২ জন পুলিসের গুপ্তচর নিহত হয়।

এই সমস্ত কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের Terrorist বা সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে থাকে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যেও একদল বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিপ্লববাদীরা প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাসবাদী নন। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশের বিপ্লবী সমিতি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, "Secret Society did not include terrorism in its programme but this element grew up in Bengal as a result of the strong repression and the reaction to it in that province." (Aurobindo Himself and Mother P. 44)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুশীলন সমিতির কর্মসূচীতে সন্ত্রাসবাদ ছিল না। সরকারী সন্ত্রাসবাদের ফলেই বাধ্য হয়ে বিপ্লবী সমিতিকে বিদেশী শাসকের মনে ভীতিউদ্রেককারী প্রত্যাঘাতমূলক হত্যাকাণ্ডের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কার্যক্রমের পেছনে একটা নীতি যে ছিল না, তা নয়। সে নীতি ব্যাখ্যা করেছেন লণ্ডনে ভারত সচিবের সহকারী কার্জন ওয়াইলীর হত্যাকারী মদনলাল ধিঙড়া—"I admit, the other day, I attempted to shed British blood, as an humble revenge for the inhuman hanging and deportations of patriotic Indian youth. I believe that a nation held in bondage with the help of foreign bayonet is in perpetual state of war. Since open battle is renderd impossible to an unarmed race, I attacked by surprise. Since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired. The war of independence will continue between India and England so long as the English and Hindu races last if the present unnatural relation does not cease." সুতরাং এ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নন, বিপ্লবী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী।

১৯০২ সালে প্রথম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে সংগঠনের কর্মসূচী ছিল মানুষ গড়া বা স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সৈনিক প্রস্তুত করা। এই এই উদ্দেশ্যে তরুণদের দেহমন গঠনের কর্মসূচী সংস্থায় গৃহীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে কর্মীদের সামরিক শিক্ষা দিবার কাজও আরম্ভ হয়। শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের একটা নির্দিষ্টসংখ্যক সরবরাহ নির্ধারিত ছিল ও বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে পি. মিত্রের উপর দায়িত্ব ছিল, তাঁকে ৫০ হাজার সৈন্য সরবরাহ করতে হবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির প্রকাশ্য কাজ ছিল লাঠি ও ছোরা খেলা। গোপনে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হচ্ছিল। গেণ্ডারিয়ার সরকারী ছাউনির সিপাহীদের মারফত অতি সংগোপনে বন্দুক ও কার্টিজ প্রভৃতি পাওয়া যেত। এ সমস্ত কর্তৃপক্ষের জানার কথা নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সমিতি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন স্বয়ং এ কাজে ব্রতী হলেন। গুণ্ডাদলকে প্ররোচিত করে পুলিনবাবুর গৃহ আক্রমণ এবং পুলিনবাবুর কারাদণ্ডের কথা আগেই বলা হয়েছে।

আক্রমণকারী গুণ্ডাগণ যখন বলছিল, "নবাবের হুকুম, গৃহের মেয়েছেলে টেনে বার কর, পরে ওকে দেখে নিবি।' ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন এসে বললেন, "পুলিনবাবুর গৃহ ঘিরে রেখে গৃহের পুরুষদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে।" গুণ্ডারা আক্রমণকারী হওয়া সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হল না। সরকারী রোষ সমস্তই আক্রান্ত পুলিনবাবুর উপর। এ সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, ঘটনার অব্যবহিত পরেই নবাব সলিমুল্লা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে চলে যান এবং সমিতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে পরামর্শ করেন। সিটী ইনস্পেক্টর মিঃ হাউই প্রকাশ্যভাবে বললেন, "তোমাদের লীডারকে পেয়েছি। দেখি, এবারে সে কোথায় যায়।" সমিতির অন্যতম সদস্য জ্যোতির্ময়ের মামলায় অন্যায়ভাবে তাঁকে দণ্ডিত করা হয়েছে, প্রবীণ উকিলগণ এরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করলে বাঙ্গালী বিচারক তাঁদের কাছে বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের গোপন আদেশেই তিনি ঐরূপ করেছেন। এই সমস্ত কারণে একদল যুবক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের শাস্তিবিধান সম্পর্কে পুলিনবাবুর অভিমত জানতে চান। কিন্তু পুলিনবাবু তাঁদের বলেন যে, দুই একজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করলে কোন লাভ হবে না। তবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্কেত স্বরূপ রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা এবং উক্ত রাজকর্মচারীদের হত্যা করা যেতে পারে—এটা শুধু তাঁর নয়, পি. মিত্রেরও এই ছিল অভিমত। ছেলেরা লাঠি খেলতে সমিতিতে আসত। ছেলেরা না এলেই সমিতি নিজে থেকেই ভেঙ্গে যাবে, এজন্য পুলিশ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের ভীতি প্রদর্শন করে পুলিশের নিকট পুলিনবাবুর বিরুদ্ধে ছেলে চুরির অভিযোগ করতে বাধ্য করে। এইভাবে পুলিশ ১৪টি বালককে অপহরণ করার অভিযোগে পুলিনবাবুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করে। এক মামলা ব্যর্থ হলে আবার দ্বিতীয় মামলায় গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে দেয়। শেষ পর্যন্ত পুলিনবাবু জামিন পেলেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি মামলা ঝুলে রইল। রজনী গুপ্ত, ত্রৈলোক্য বসু, আনন্দ চক্রবর্তী, ললিত রায় প্রভৃতি পুলিনবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী উকিল তাঁকে জানালেন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে সমিতি চলতে দিবে না। তাঁরা পুলিনবাবুকে আত্মগোপন করবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুলিনবাবু আত্মগোপন করতে সম্মত হলেন না। কারণ, তাহলে সমিতি একেবারেই ভেঙ্গে যাবে। এর ৭।৮ দিন পরেই সমিতি নিষিদ্ধ হল এবং পুলিনবাবু ও ভূপেশ নাগকে ৩ আইনে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিনবাবুর কারাজীবন মণ্টগোমারী জেলে কাটে। ১৪ মাস জেলে ছিলেন তিনি। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে কলকাতা এসেই তিনি পি. মিত্রের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করেন। তিনি পুলিনবাবুকে বুকে চেপে ধরেন এবং তাঁর পত্নীও এসে পুলিনবাবুকে আশীর্বাদ করেন। অরবিন্দ এই সময়ে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়েছেন। পুলিনবাবু তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। অরবিন্দ বলেন, দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি একসঙ্গে কাজ করলে দেশের কল্যাণ হবে। পুলিনবাবুর নিজেরও এই মত বলে তিনি তাঁকে জানান।

সমিতির বিরুদ্ধে এত অত্যাচার সত্ত্বেও একমাত্র এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কোন গুপ্তহত্যার কাজ পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু পুলিনবাবুর গ্রেপ্তারের পরও সমিতির উপর নিপীড়ন চলতে লাগল। ফলে সমিতিও ক্রমে প্রত্যাঘাত করার জন্য প্রস্তুত হল। ইংরেজ রাজের সঙ্গে সমিতির দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হল। এই সংগ্রাম ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। মাত্র ৩।৪ মাস মুক্ত জীবন ভোগ করার পরে পুলিন বাবু ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। পুলিন বাবুর গ্রেপ্তারের পরে আশুতোষ দাসগুপ্ত সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নেতা হলেন মাখন সেন এবং তার পরে নরেন সেন। পরবর্তী যৌথ নেতৃত্বে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, কেদারেশ্বর সেন, রমেশ আচার্য এবং রবি সেন।

শাসক শ্রেণীর কথা—বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, বাঙ্গালীর কোনদিন সাম্রাজ্য ছিল না, বাঙ্গালীর গৌরব করবার মত কিছুই নাই। তাই বাঙ্গালীর সামরিক জীবনও নাই। কিন্তু অতীত ১০০ বৎসরে এই বাঙ্গালী সমগ্র ভারতকে যুগিয়েছে প্রেরণা। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়, সমর-বিদ্যায়ও। আর্য-অনার্যের রক্তের মিশ্রণে ভাগীরথী এবং পদ্মার কূলে নীরবে জন্ম নিয়েছিল এক নূতন প্রতিভা। বাঙ্গালী নিয়েছিল মৃত্যুর দীক্ষা। তাই ভারতে নূতন ক্ষাত্রতেজের জন্ম বাঙ্গালীরই অবদান। পঞ্চনদে শিখ ছিল, রাজপুতনায় রাজপুত ছিল, মহারাষ্ট্রে মারাঠা ছিল; কিন্তু নবভারতের দুজন সেনানায়ক রাসবিহারী ও নেতাজী দুজনেই বাঙ্গালী। ইংরেজের সেনাদলে সকলেরই স্থান ছিল। শুধু স্থান হয় নাই বাঙ্গালীর। তাই স্বাধীনতাসমরে বাঙ্গালী নিজের স্থান গড়ে নিয়েছিল। ইংরেজ সবারই হাতে অস্ত্র দিয়েছিল কিন্তু দেয়নি কেবল বাঙ্গালীর হাতে। মনে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় মনুষ্যত্বে এত বড় একটা জাতিকে ক্ষাত্রতেজে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল পরিকল্পিত নীতি অনুসারে। তাই বাঙ্গালী স্বাধীনতা-সমরে আপনার স্থান করে নিয়েছিল। বাঙ্গালীর হাতে যদি অস্ত্র থাকত তবে বাঙ্গালী পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে আঘাত করত না। কিন্তু শহীদ মদনলাল যা বলেছেন একমাত্র বাঙ্গালীই তা বুঝেছিল। শাসকশক্তির সঙ্গে পরাধীন জাতির সংগ্রাম চিরন্তন। বাঙ্গালীর

হাতে রাইফেল নেই, তাই, তার হাতে গর্জে উঠেছিল বোমা। রাইফেলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে পিস্তল নিয়ে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাঙ্গালী বারবার চেষ্টা করেছে পশ্চাৎ দিক থেকে আঘাত না করে সম্মুখসমরে শত্রুর সম্মুখীন হতে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে তার সেই প্রচেষ্টাই সফল হয়েছে। এটাই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস। এর প্রস্তুতিপর্ব থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বাধা পেয়েছে সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে। ১৯০২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল বিপ্লবী বাংলার এক বিজয়-গৌরবের ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, বিপ্লবী ভারত বিজয়ী হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকা ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র এবং রাজাবাজার ও দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

সরকার এতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে সমিতিকে বিপর্যস্ত করে সমিতি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এবারে তাদের পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন হল। তারা বৃহত্তর আঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে পুলিনবাবু মণ্টগোমারি জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এর পশ্চাতেও সরকারেরই কিছুটা ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে হয়। কারণ পুলিনবাবু ঢাকায় এসে দেখলেন পুলিশের কর্মতৎপরতা আগের চেয়ে অনেকটা বেড়েছে। যে সকল যুবক বা সমিতির কর্মী পুলিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে নানারূপ প্রশ্ন করা হত। কাউকে কাউকে আটক করেও রাখা হত। ঢাকা আসার কয়েকদিন পরেই পুলিশ পুলিনবাবুর বাসা তল্লাসি করে কিছু চিঠি ও কাগজপত্র নিয়ে যায়; ঐ সময় তারা একটি খেলনা বন্দুকও নিয়ে যায়। তারা অস্ত্র আইনে পুলিনবাবুকে গ্রেপ্তার করে। তিনি থানায় গিয়ে দেখতে পান আরও দুই তিনজন যুবক গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন। পুলিনবাবু এবং ধৃত যুবকদের জেলে পাঠান হল। কয়েকদিন পরে ঢাকার উকিল ললিত রায় এবং আরও দশ-বারজন যুবক গ্রেপ্তার হয়ে এলেন। এর মধ্যে ছিলেন শচীন ব্যানার্জি, শশী সরকার, টাঙ্গাইলের মোক্তার অমর ঘোষ, সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান বঙ্কিম রায় প্রভৃতি। মোট পঞ্চান্ন জনের নামে পরোয়ানা বের হয়েছিল। এর মধ্যে দুইজন ছিলেন পরলোকে, চুয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অবশিষ্ট নয়জন ছিলেন পলাতক। পলাতকদের মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং অমৃত হাজরার নাম উল্লেখযোগ্য। পুলিনবাবুকেও অস্ত্র আইন থেকে মুক্তি দিয়ে ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হল। অভিযোগ হল—রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধহেতু অস্ত্র সংগ্রহ এবং রাজদ্রোহিতা। যথাসময়ে প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হল। আসামী পক্ষে উকিল ছিলেন শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বসু, বিভু গুহঠাকুরতা, নিবারণ গুহমুস্তাফি এবং আরো কয়েকজন। পি. মিত্র এই মোকদ্দমার দায়িত্বভার গ্রহণে খুবই উৎসুক ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি উকিলদের কাছে দু-তিনখানা চিঠিও লিখেছিলেন। কলকাতায় তিনি এই মামলা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিভাবে মামলা পরিচালনা করতে হবে এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় একদিন আলোচনার সময় ধার্য হয়। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি গুরুতর রোগে পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ঢাকার বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর শেষপত্র—

"I feel my end is approaching. Do convey to my dear Pulin and other Dacca boys now undergoing trial that my last thoughts are with them."

সাড়ম্বরে মামলা আরম্ভ হল। শোনা যায়, মামলার কাগজপত্র দেখবার জন্য পি. এল. রায়কে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। যে বাড়ীতে সমিতির কেন্দ্র ছিল ঐ বাড়ীতেই বিভিন্ন সাক্ষীকে শিক্ষা দেওয়া হত। সরকারী উকিল সরোজ ঘোষ এজন্য পেতেন দৈনিক একশত টাকা। প্রায় চারশত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। কলকাতা থেকে সি আর. দাস এসে আসামী পক্ষের প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হলেন। প্রাথমিক বিচারেই অমর ঘোষ মুক্তি লাভ করলেন। এরপরে সেসন আদালতে বিচার আরম্ভ হল। মোকদ্দমা আরম্ভ হবার পূর্বে সি. আর. দাস একদিন এসে পুলিনবাবুকে জানালেন, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মোকদ্দমা আপসে মিটিয়ে ফেলবার এক প্রস্তাব দিয়েছেন। বিপ্লবীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবেন; দু'চারজনের সামান্য শাস্তি হবে; অপর সকলকেই মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু শ্রীশবাবু এবং ঢাকার অন্যান্য উকিলগণ এ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এর পরে সি. আর দাস পুলিনবাবুকে জানালেন, আপসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। সেসন আদালতে দুমাস মামলা চলবার পর সেসন জজ রায় দিলেন। ললিত রায়, শশী সরকার, ধীরেন সেন, নালনী গুহ, যোগেন্দ্র দাস, হেম সেন এবং আরও কয়েকজন মুক্তি পেলেন। পুলিনবাবু, আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জ্যোতির্ময় রায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অন্যান্য কয়েকজনের তিন বৎসর থেকে দশ বৎসর কারাদণ্ড হল। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হল। বিচারপতি হ্যারিংটন, বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জী এবং বিচারপতি কেসপার্স—এই তিনজনের সম্মুখে বিচার হল। ছয়মাস মামলা চলে বিচার শেষ হল। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আসামী পক্ষের উকিলগণ এসে পুলিনবাবুকে ও অন্যান্য বন্দীদের জানালেন, অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা সাথক হয়েছে। হাই-কোর্টের বিচারে পুলিনবাবুর দণ্ড কমে সাত বৎসর, আশুতোষ দাসগুপ্তের দণ্ড ছয় বৎসর এবং জ্যোতির্ময় রায়ের ছয় বৎসর দীপান্তর দণ্ড হল। অন্যান্য বন্দীদের দণ্ড কমে দুই বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হল। পুলিনবাবুকে

আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হল। এখানে একমাস থেকে তিনি আন্দামান যাত্রা করলেন। '৯২১ সালে তিনি আন্দামান থেকে মুক্তি পান। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পরই গভর্ণমেণ্ট-এর পক্ষ থেকে সমিতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আঘাত এল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। ৩৭ জনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অভি-যোগে অভিযুক্ত করা হল। প্রাথমিক বিচারে কয়েকজন মুক্তি পেলেন। শেষ পর্যন্ত বরিশালের দায়রা জজ ক্যামেইড-এর আদালতে ২৬ জনের বিচার আরম্ভ হল। দুজন রাজসাক্ষী হন। এদের নাম গিরীন্দ্র দাসগুপ্ত এবং রজনীকান্ত দাস। ২৬ জন আসামীর মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র সেন, মণীন্দ্রভূষণ রায়, ধীরেন বসু, হেমেন্দ্র মুখুটি প্রভৃতি। হেমেন্দ্র মুখুটি দুর্গাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা হয় ১৯১৩ সালে। কিন্তু ১৯১২ সাল থেকেই এর উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যামিনী দাসের দুইপুত্র সত্যেন্দ্র ও গিরীন্দ্র দলের সদস্য ছিলেন। দুইপুত্র মাতার সাথে ঢাকাতে ছিলেন। ঐ গৃহে একটি ট্রাঙ্কে ডাকাতির কিছু অলংকার রক্ষিত ছিল। গিরীন্দ্রের মাতা এ সম্পর্কে জানতে পেরে স্বামীকে জানান। গিরীন্দ্রের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ট্রাঙ্কটি আনবার জন্য মদন ভৌমিক এবং রমেশ আচার্য যান। কিন্তু যামিনীবাবু তাঁদের আটক করে পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন। গিরীন্দ্রকেও এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। গিরীন্দ্র ও মদনবাবুর বিরুদ্ধে আলাদা এক মামলা হয়। কিন্তু গিরীন্দ্র আদালতে বলেন যে, মদনবাবু এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফলে মদনবাবু মুক্তি পান এবং গিরীন্দ্রের আড়াই বৎসর কারাদণ্ড হয়। কারাগারে মাতা ও পিতা গিরীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হতে প্ররোচিত করে। রমেশ আচার্য এর কিছু দিন আগে বরিশালের ভার নিয়ে যান। তিনি এবং যতীন রায় একটি বোর্ডিং হাউস স্থাপন করেছিলেন। এই বোর্ডিং হাউসই ছিল সমিতির বরিশাল জেলা কেন্দ্রের অফিস। নিশি চক্রবর্তী নামে জনৈক গুপ্তচর জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে বোর্ডিং-এ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। রমেশ আচার্য বরিশালেই গ্রেপ্তার হন। যতীন রায় গ্রেপ্তার হন ঢাকাতে। গোপাল মুখার্জী, দেবেন ঘোষ, চণ্ডী বসু, যতীন ঘোষ, সারদা ভট্টাচার্য, জ্ঞানরঞ্জন দাশগুপ্ত, নলিনী মিত্র, সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি আসামী ছিলেন। এছাড়া প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী এবং খগেন চৌধুরীর নামেও ওয়ারেণ্ট ছিল। কিন্তু তাঁরা ফেরার হন। সেসন আদালতের বিচারে রমেশ আচার্য এবং যতীন রায় ১২ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। রোহিণী গুহ, নিবারণ

কর এবং যতীন ঘোষের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রিয়নাথ আচার্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র বণিক ও গোপাল মুখার্জির ৭ বৎসর এবং নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু এবং দেবেন্দ্র ঘোষের ৫ বৎসর কারাদণ্ড হয়। রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী।

ফেরার বিপ্লবী এবং অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে বরিশালের দায়রা জজ ক্যামেইডেনর আদালতেই পৃথক বিচার হয়। এই মামলা অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। এই মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৫ সালের ২৯শে মে এবং রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ১৫ বৎসর, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী এবং খগেন চৌধুরী ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। হাইকোর্টে প্রতুল গাঙ্গুলী এবং রমেশ চৌধুরী মুক্তি পান। বাহ্রা ডাকাতির পরে অমৃত হাজরাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তিনি ফেরার হয়ে কলকাতা চলে আসেন। এখানে এসে ক্রমে তিনি চন্দননগরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সে যুগে চন্দননগর থেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার রিভলভার সরবরাহ হত। চন্দননগর থেকে রিভলভার সংগ্রহই অমৃত হাজরার উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে চন্দননগরে বোমা তৈরীর ভার অমৃত হাজরার উপর পড়ে। এ সম্পর্কে মতিলাল রায় বলেন, "১৯১২ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতির সহিত পরিচয় ক্রমেই দৃঢ় হয়। শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরাকে পাইয়া এতদিন যে বোমা টিনের কৌটায় পিকরিক অ্যাসিড ভরিয়া তার জড়াইয়া ফসফরাস ক্যাপের সাহায্যে অত্যাচারীর প্রাণ নাশের জন্য ব্যবহার করা হইতেছিল অতঃপর তাহা কাষ্ট আয়রণ-এ নির্মাণ করার সুযোগ হইল। টিনে বিদীর্ণ হওয়ায় যে ফল লাভ হইত কাষ্ট আয়রণের খোলে বিস্ফোরক বস্তুর বিদারণে এইরূপ বোমার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই কর্মের কৃতিত্ব একমাত্র শশাঙ্কেরই।" ২৯৬।১ আপার সার্কুলার রোডে অমৃত হাজরা বাস করতেন। এখানে তিনি বোমার খোল তৈরী করতেন। অনেক সময় এখানে বসেই তিনি বোমা তৈরী করতেন। ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর এই বাড়ী তল্লাসী হয়। সরকারী বোমা-বিশেষজ্ঞ বলেন, এখানকার তৈরী বোমাই বিভিন্ন স্থানে বিদীর্ণ হয়েছে। সকল বোমায়ই একই মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"রাজাবাজারের বাড়ীটি তল্লাসীর পরে সেখানে দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, চন্দ্রশেখর দে গ্রেপ্তার হন। মোকদ্দমার প্রাথমিক বিচার হয় আলিপুরে মিষ্টার ভীকের আদালতে। কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী 'স্বাধীনতা'

ইস্তাহার সহ গ্রেপ্তার হন কলেজ ষ্ট্রীটে ৬ই ডিসেম্বর। প্রায় দুই মাস পরে ১৯১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী খগেন্দ্র চৌধুরী ধরা পড়লেন। দায়রার বিচারে আলিপুরের অতিরিক্ত জজ প্যানটন'এর আদালতে সকলেই দণ্ডিত হন। কিন্তু এই কোর্টে আপীলে দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, চন্দ্রশেখর দে এবং কালীপদ ঘোষ মুক্তি লাভ করেন। শশাঙ্কের পূর্বদণ্ড ১৫-বৎসর দীপান্তর বহাল থাকে। খগেন্দ্র চৌধুরী বরাহনগর মোকদ্দমায় তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রায়ে তিনজন জজই একমত হয়ে বলেন, "শশাঙ্কই এই ষড়যন্ত্রে প্রধান ব্যক্তি এবং যদিও তাহার হাতে নির্মিত বোমা ভারতবর্ষের বাহিরে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রমাণ নাই কিন্তু ভারতের নানা স্থানে যে উহার ব্যবহাব হয়েছে উহা নিশ্চিত।"

রাজাবাজারে যেদিন তল্লাসী হয় তার পূর্বদিন রাত্রিতে রাসবিহারী এখানে এসেছিলেন। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত তিনি এখানে বসে কয়েকখানি চিঠি লেখেন। চিঠিগুলি দিল্লীর অধিবাসী আমীর চাঁদ ও দীননাথ তলোয়ারেব নামে। আই বি ডি এস পি শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র তল্লাসীর পরে এখান থেকে একটা ব্লটিং প্যাড নিয়ে যান। এই প্যাড থেকে তাঁরা আমীর চাঁদ ও দীননাথের নাম উদ্ধার করেন এবং দিল্লীতে আমীর চাঁদ ও দীননাথের গৃহ তল্লাসী করা হয়। আমীর চাঁদ ছিলেন দিল্লীর সেণ্ট যোসেফ স্কুলের শিক্ষক। তাঁকে এবং দীননাথ তলোয়ারকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয় এবং আউধ বিহারী, বালমুকুন্দ, রঘুবর শর্মা, বালরাজ এবং হনুমন্ত সহায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে দিল্লীর মামলা দায়ের করা হয়।

এর আগে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজকীয় শোভাযাত্রায় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দীননাথ গ্রেপ্তারের পরে স্বীকারোক্তি করে এবং রাজসাক্ষী হয়। ফলে পুলিশ এই বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে কারা জড়িত জানতে পারে।

হরদয়াল নামে দিল্লীর এক বাসিন্দা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। এই সময় তিনি পাঞ্জাবের বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি দিল্লীতে এসে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ, আউধ বিহারীকে তিনি দলভুক্ত করেন। ১৯০৫ সালে সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন অক্সফোর্ডে পড়তে যান, বিপ্লবী সংগঠনের ভার তিনি সংগঠনের অন্যতম সদস্য জিতেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করে যান।

১৯০৮ সালে মুরারিপুকুর কেন্দ্রে তল্লাসীর সময় রাসবিহারীর দুখানি পত্র সেখানে ধরা পড়ে এবং রাসবিহারী গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময় তেঘরিয়ায় শশীভূষণ রায় চৌধুরী তাঁকে দেরাদুনে পাঠিয়ে

দেন। একবার এক বিবাহ উপলক্ষ্যে জিতেন্দ্রমোহন দেরাদুন যান। এখানে রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জিতেন্দ্রমোহনকে কিছু দিন দেরাদুনে অবস্থান করতে হয়। বন্ধুত্ব অচিরেই বৈপ্লবিক হৃদ্যতায় পরিণত হয়। রাসবিহারী দিল্লীর বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। কিছুদিন পরে জিতেন্দ্রমোহন ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য বিলাত চলে যান। এই সময়ে তিনি দলের নেতৃত্বভার রাসবিহারীর উপর অর্পণ করে যান। রাসবিহারীর নেতৃত্বগুণ ছিল অসাধারণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লী সংগঠনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। রাসবিহারী বলতেন, ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার ভারতবাসীর কাম্য হওয়া উচিত নয়। বঙ্গভঙ্গ রদও আমাদের শেষলক্ষ্য নয়। আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, বৃটিশ শাসনের অবসান। এই সমস্ত কথা তিনি 'Liberty' ইস্তাহারে লিখতেন। আউধবিহারী তা কর্পূরতলায় মুদ্রিত করতেন। বালমুকুন্দ তা বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করতেন।

১৯১১ সালে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগর সংহতির মিলন সাধিত হয়েছে। উভয় সংগঠনই একসঙ্গে চলছে। রাসবিহারী ক্রমে দুই সংগঠনেরই নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। অনুশীলন-চন্দননগরের এক মিলিত সভায় রাসবিহারী প্রস্তাব করলেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ্যাকশনের পরিবর্তে এমন একটি বৃহৎ কিছু করতে হবে যাতে বিশ্ববাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহের বিষয় জানতে পারে। তিনি বললেন, পূর্ব বৎসর সম্রাট পঞ্চম জজ এসে জাঁকজমক করে দরবার করে গেছেন। এবারে ১৯১২ সালে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষ্যে আবার দরবারের আয়োজন চলছে। এতে বিশ্বের নিকট ভারতবাসীর রাজভক্তিই প্রচারিত হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করব। স্থির হল, দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠানে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হবে। রাসবিহারী বললেন, দিল্লীতে একাজ বাঙ্গালী বিপ্লবীদের করতে হবে। তা হলে উত্তর ভারত সংগঠনের সঙ্গে বাংলা সংগঠনের সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে। রাসবিহারী দিল্লী যাবার সময়ে মতিলাল রায়ের কাছ থেকে বসন্ত বিশ্বাস নামে এক তরুণ এবং একটি বোমা নিয়ে গেলেন। বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরে এক ঔষধের দোকানে চাকুরি দিয়ে রাখলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় শোভাযাত্রার দিন। ১৯শে ডিসেম্বর বসন্ত বিশ্বাসকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হল। ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট বিপুল আড়ম্বরে রাজন্যবৃন্দপরিবৃত হয়ে হাতিতে চড়ে চাঁদনী চক দিয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'দেওয়ানই আম'-এর দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাঞ্জাব

ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ভবনের দোতলা থেকে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত বসন্তের বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত বোমা নিক্ষিপ্ত হল। বোমা সশব্দে বিস্ফোরিত হল। হাতির চোপদার নিহত হল। বোমার ছিটকিনির আঘাতে রাজপ্রতিনিধিও আহত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। রাজদরবার বন্ধ হল, শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হল। বিপ্লবীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু কে এ ঘটিয়েছে পুলিশ জানতে পারল না। পরে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গর্ডনকে হত্যার ব্যবস্থা হল। এ কাজেরও ভার দেওয়া হল বসন্ত বিশ্বাসের উপর। বসন্ত বোমাটি বাগানে স্থাপন করার অব্যবহিত পরে গর্ডন আসার আগেই রামপদর্থম নামে জনৈক দারোয়ান ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পায়ে লেগে বোমাটি ফেটে রামপদর্থম নিহত হয়। বসন্তকে নিকটেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এর পরে দিল্লীর গ্রেপ্তারের পরে দীননাথ রাজসাক্ষী হলে বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা বিস্ফোরণ ও গর্ডন হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্র মামলায় আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ এবং আউধ বিহারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বালরাজ, বসন্তকুমার এবং হনুমন্ত সহায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বসন্তকুমারের বিচারের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপীল করে। ফলে তিনিও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মামলায় রাসবিহারীও আসামী ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করেন। তাঁকে ধরবার জন্য ১২৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এর পরে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে রত হন। তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সরকার পক্ষের উকিল বলেন, "Rashbehari floats down Lahore into the Presidency of Bengal. He goes down with a moustache and comes up clean-shaven—he goes down a Punjabi but comes a Bengali."

১৯১৪ সালের ৩রা মে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ আয়োজনও আরম্ভ হয়। ১৯১৫ সালের ১২ই মে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। এই বৎসরাধিক কাল ধরে তাঁকে গ্রেপ্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি সমস্ত ভারত ঘুরে ব্যাপক বিদ্রোহ সংগঠনে রত ছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আরম্ভ করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঠান প্রভৃতি সৈন্যদলের সঙ্গে

সংযোগ স্থাপন করে তিনি ইংরেজসাম্রাজ্যবিরোধী বিদ্রোহে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই সমস্ত ষড়যন্ত্র মামলার সাহায্যে বিপ্লবী সংহতি ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হলেও সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সমিতি শুধু শক্তিশালী হয় নাই, ভারতের পূর্বাঞ্চলে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সমিতি থেকে ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অনুশীলনের নেতৃবৃন্দ ঠিকই বুঝেছিলেন, সংগ্রামের পথই বিপ্লবীর পথ, সংগ্রামের ভিতর দিয়েই বিপ্লবীরা শক্তি সঞ্চয় করেন। রাসবিহারীর নেতৃত্বও এই নীতি অনুমোদন করে বিপ্লবী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুশীলন-চন্দননগর-কাশী-দিল্লী-গদর বিদ্রোহীদের মিলন ও ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা

বাহ্রা ডাকাতির পরে শশী সরকার ও অমৃত হাজরার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়। তাঁদের নামে যথাক্রমে ১০০০ টাকা ও ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তাঁরা ফেরার হন। সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের ধরতে পারে নি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অমৃত বাবুই ছিলেন দলের সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার ভারও তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। এই অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই অমৃত বাবু একদিন চন্দননগরে যান। এ সম্পর্কে শ্রীমতিলাল রায় বলেন, "একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীরামপুরে সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের সহিত এক সুপুরুষ তরুণ আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ বাবু আমাকে তরুণ ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে ঢাকার অনুশীলন সমিতির ইনি একজন সুদক্ষ কর্মী এবং বাহ্রা ডাকাতির একজন পলাতক আসামী। কলকাতায় আইস্ ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। ইঁহার নাম অমৃত হাজরা। বর্তমানে বিপ্লবী মহলে শশাঙ্ক নামে পরিচিত।"

বাংলাদেশে স্বদেশী যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই "সৎপথালম্বী সম্প্রদায়" নামে এক সংগঠন ছিল। এর কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল রায়, সাগরকালী ঘোষ, ননীলাল দে এবং সত্যচরণ কর্মকার। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীদের উদ্যোগে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে এই সময় বারীন্দ্রকুমার একদিন কর্মী-সংগ্রহের জন্য চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন। চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেই একদিন এসে দলের সদস্য হয়েছেন। চন্দননগরেই ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের আলোচনা হয়। চারুবাবু দলে যোগ দিতে স্বীকৃত হন। ক্রমে উকিল বনমালী ঘোষ, পুলিশ কোতয়াল ধ্রুবদাস কোলে, শ্রীশ ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল রায় প্রভৃতি কলকাতার বিপ্লবী দলভুক্ত হলেন। ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবিগণ যুগান্তর পত্রিকা পরিচালনার ভার অন্যান্যদের উপর অর্পণ করে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব অনুষ্ঠানে রত হন। পূর্ববঙ্গের লাট ফুলার এবং

পশ্চিম বঙ্গের লাট এনড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার জন্য কলকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি কিছু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় কানাইলালের ডাক পড়ল হেম কানুনগোর নিকট বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখবার জন্য। ১লা মে মানিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। চারুবাবুকে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেন।

কিন্তু এই প্রথম আঘাতেই চন্দননগরের দল ভেঙে পড়ল না। মে মাসের মধ্যভাগে চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ এবং মতিলাল রায় উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বাবুরাম পরারকার প্রভৃতি মিলিত হয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে মানিকতলার অসমাপ্ত কার্য তাঁরা সমাপ্ত করবেন।

মানিকতলা মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গমন করেন। কিন্তু এর আগেই তিনি সুরেশচন্দ্র দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুরেশচন্দ্র এম. এস সি. ক্লাসের রসায়নের ছাত্র, বোমা তৈরীর ব্যাপারেই মানিকতলা বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। স্থির হয় যে, এর পরে চন্দননগরেই বোমা প্রস্তুতির ব্যবস্থা হবে। নগেন্দ্র নাথ এবং মণীন্দ্র নায়ক এই বোমা প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে চন্দননগর থেকেই বিপ্লব যুগে ভারতের সর্বত্র বোমা সরবরাহ হত।

মানিকতলা মামলা সম্পর্কে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পর বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লব সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে ভেঙে যায়। এর আরও একটি কারণ ছিল। অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ শাখা অর্থসংগ্রহ সম্পর্কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। তারা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করত বলে কারুর ওপরে নির্ভর করতে হত না। কিন্তু কলকাতার মূল সমিতি চলত প্রধানত বড়লোকদের চাঁদায়। এইভাবে নাড়াজোলের নরেন্দ্রলাল খান, উত্তরপাড়ার মিছরী বাবু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই এবং কাঁথীর জমিদার নন্দরা বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু বোমার মামলা সম্পর্কে নরেন গোঁসাই ধরা পড়লে বড়লোকেরা সকলেই হাত গুটিয়ে ফেলেন। ফলে তরুণদের মধ্যে যাঁরা তখনও বাইরে ছিলেন তাঁরাও দল পরি-চালনে অক্ষম হলেন। এর ফলেই চন্দননগর দল মূল সমিতি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগর সমিতির মিলন ঘটে। উভয় দলই এই সময় সক্রিয় ছিল। চন্দননগর দলের রাসবিহারী বাংলার বাইরে বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলেন এবং চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির কাজ চলছিল। পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সংগঠন

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐবং ব্রহ্মদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং সরকারের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম চলছে।

প্রকৃত পক্ষে অমৃত হাজরাই চন্দননগর সংহতি ও অনুশীলন সংহতির মিলন ঘটান। প্রথম পরিচয়ের দু-এক দিন পরেই অমৃত বাবু পুনরায় চন্দননগরে এসে মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মতি বাবু বলেন, "ধর্মপ্রাণ এই যুবক এসে আমার অন্তরঙ্গ শিষ্য রূপে আমার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তাঁহার কথায় আমি তদানীন্তন অনুশীলন সমিতির প্রধান নায়ক মাখনলাল সেনের সহিত সংযোগ স্থাপন করি। শশাঙ্কের নিদেশে আমি ও শ্রীশচন্দ্র সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে কোন এক অন্ধকার স্যাঁৎসেতে গৃহে মাখন লাল সেনের সহিত সাক্ষাৎ করি। মাখন বাবু সোনারং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বৈপ্লবিক ঘটনায় তিনি এক প্রকার গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় বাস করছিলেন।"

আলোচনার ফলাফল জানবার জন্য অমৃতলাল পরদিনই আবার চন্দননগর উপস্থিত হলেন। কিন্তু মতি বাবু তাঁকে জানান যে শুধু ধর্মতত্ত্ব নিয়েই দু-জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই দিন মতি বাবুর সঙ্গে অমৃত বাবুর দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়। এরপরে প্রায়ই তিনি চন্দননগরে যেতেন এবং মতি বাবুর নিকট থেকে অস্ত্রাদি নিয়ে আসতেন। মতি বাবুও নিজের লোক মনে করে অমৃত বাবুকে সর্বদা সাহায্য করতেন। এই পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যেই চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির ভার অমৃত বাবুর উপর এসে পড়ে। অমৃত বাবুর হাতে তৈরী বোমা সম্পর্কে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এক একটি বোমা অর্ধেক রেজিমেণ্ট ধ্বংস করতে পারত।

চন্দননগর ও অনুশীলন সমিতির পারস্পরিক সৌহার্দ্য যখন এই ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এই সময় একদিন শচীন সান্যাল কাশী থেকে কলকাতায় উপস্থিত হলেন। তিনি মাখন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শচীন্দ্রনাথ পূর্বে কলকাতায় অনুশীলন সমিতিতে লাঠি-খেলতেন, পরে কাশী গিয়ে তিনি অনুশীলন সমিতি নাম দিয়ে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। বাংলা সংগঠন এবং কাশী সংগঠন যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই ছিল শচীন্দ্রনাথের কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য। কিন্তু মাখন বাবুর সঙ্গে আলোচনা এ কার্যে বিশেষ সহায়ক হল না। মাখন বাবুর সঙ্গে শচীন বাবুর আলোচনাকালে অমৃত বাবু নীরব-দর্শক রূপেই উপস্থিত ছিলেন। ফিরে যাবার সময়ে তিনি কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে শচীন বাবুকে ডেকে বসালেন। মাখন বাবু এই সময়ে পটুয়াটোলা লেনে বাস করতেন। অমৃত বাবু শচীন বাবুর উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ

করেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শচীন্দ্রনাথ অমৃত বাবুর কাছে একটি রিভলভার চাইলেন। অমৃত বাবু পরদিন অনুশীলন সমিতির রাজা-বাজার কেন্দ্র থেকে একটি রিভলভার নিয়ে যেতে বললেন। শচীন্দ্রনাথ চলে গেলে অমৃতবাবু তৎক্ষণাৎ চন্দননগর চলে যান এবং মতিবাবু ও শ্রীশ চন্দ্রকে সব জানান। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাজাবাজার কেন্দ্রে তিনজন শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হলেন। ঐদিন প্রতুল বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতুল বাবু তখন ফেরার। আলোচনায় শচীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হলেন। স্থির হল মিলিত দলের বৈপ্লবিক কাজকর্ম একই সঙ্গে চলবে। অঙ্গীকার অনুযায়ী অমৃতবাবু শচীন্দ্রনাথকে একটি রিভলভার দিলেন।

১৯১১ সালে রাসবিহারীর বিমাতার মৃত্যু হয় এবং রাসবিহারী তাঁর কর্ম-স্থল দেরাদুন থেকে চন্দননগরে এসে দেড় মাসাধিক কাল বাস করেন। বিমাতার শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত চন্দননগরেই তাঁকে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ে তিনি পুরাপুরি চন্দননগর দলভুক্ত হন। এর আগেই তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের মাধ্যমে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বাইরে দিল্লী দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর একটা অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। অনুশীলন দলের সহিত চন্দননগরের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল এবং রাসবিহারী মিলিত দলের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করলেন।

আপার সার্কুলার রোডে বাদুড়বাগানে সমিতির একটি গোপন মিলনস্থান ছিল। চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ একদিন এখানে রাসবিহারীকে নিয়ে এসে অনুশীলন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অমৃত হাজরা এর আগেই একদিন প্রতুল গাঙ্গুলী এবং নরেন সেনকে চন্দননগরে নিয়ে গিয়ে মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বাদুড়বাগান কেন্দ্র সম্পর্কে মতিবাবু বলেন, "বাদুড়বাগান বস্তিতে আমাদের বিপ্লবীদের শক্তিশালী সংহতির কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানে বসিয়া আমরা বাংলায় বিপ্লবের আগুন ছড়াইতাম। এইখান হইতেই যোগীন্দ্রনাথ মৌলবী বাজারের মেজিষ্ট্রেট গর্ডনকে হত্যার জন্য বোমা লইয়া প্রস্থান করে। এইখানে বসিয়াই প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করিত।" (আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী। পৃষ্ঠা ১০৯)

এই সময় সম্পর্কে অমৃত হাজরা বলেন, "এই সময় নরেন সেন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে হঠাৎ গ্রেপ্তার হইয়া যান। মাখনবাবু প্রকাশ্য নেতা হইলেও সমিতির প্রকৃত পরিচালক ছিলেন নরেন সেন। তিনি জেল হইতে

বলিয়া পাঠাইলেন জগবন্ধু আশ্রমের ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তীকে নেতা করিয়া যেন ইহার পর বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাব আমার মনঃপূত ছিল না। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, আমি, রমেশ চৌধুরী এবং প্রতুল গাঙ্গুলী এক বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করি যে মতিবাবুকে দলের নেতা করিয়া কাজ চালাইতে হইবে। অন্যান্য সকল বিশিষ্ট কর্মী আমাদের সমর্থন করেন।" (যুগশঙ্খ, ৮ই জুলাই ১৯৭১)

রাসবিহারীর ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। চন্দননগর ত্যাগ করার সময় তিনি মতিবাবুকে বললেন, উত্তর ভারতে একদল বিপ্লবী আছে। তিনি তাদের বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে এসে কেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং পূজার ছুটি নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসেই ফিরে আসবেন। কথা অনুযায়ী অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দেড় মাসের ছুটি নিয়ে চন্দননগরে ফিরে এলেন। ফলে অনুশীলন ও চন্দননগরের মিলন সংক্রান্ত পূর্ব ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হল। মিলিত দলের বৈপ্লবিক কর্মসূচী রচনার ভার গ্রহণ করলেন রাসবিহারী এবং মতিবাবুর পরিবর্তে তিনিই হলেন মিলিত দলের নায়ক। অমৃত হাজরা বলেন, "১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর দলের রাজাবাজার কেন্দ্রে পুলিশ হানা দেয় রাত তিনটার সময়। রাত দুইটা পর্যন্ত রাসবিহারী এখানে ছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়।" রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এরই পরিণতি এবং এর মূলে ছিল চন্দননগর ও অনুশীলন দলের মিলন। মতিবাবু বলেন, "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পূর্ববঙ্গের কার্যকলাপের সঙ্গে চন্দননগরের সম্পর্ক অবিভাজ্য হইয়া উঠিল। ঢাকার প্রত্যেক ডাকাতির হিসাবও চন্দননগরে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল।"

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে বিপ্লবীদের এক মিলিত বৈঠকে স্থির হল যে, বৈপ্লবিক উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'লিবার্টি' নামে এক ইংরেজী ইস্তাহার প্রচার করা হবে। ইস্তাহারটি ছিল এইরূপ : "বিপ্লব মানুষ করে না, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল দত্ত, মদনলাল ধিঙড়া প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভগবান নিজেই নিজের কাজ করেছেন এবং এই একই ভগবান দিল্লীতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। ভারতের অমর শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলে দলে এগিয়ে এলেই তাঁদের নিকট ঋণ শোধ হবে।"

অমৃত হাজরার মাধ্যমে কি ভাবে অনুশীলন-কাশীর দল অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের দলের মিলন ঘটেছিল এবং কি ভাবে তা

অনুশীলন-চন্দননগর-কাশী দলের মিলনে পরিণতি লাভ করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে কর্মসংস্থানের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে হাজার হাজার ভারতীয় কর্মসংগ্রহের জন্য বিদেশে বেরিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে পাঞ্জাবীই বেশী। ক্রমে মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং সাংহাই হয়ে এরা আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল স্থানে পুলিশের কাজ এবং অন্যান্য ধরণের কোন কোন কাজ এদের কাছে সহজলভ্য ছিল। কেউ কেউ ব্যবসায় এবং ঠিকাদারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। ১৯১৪ সালে জুন মাসে যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে তখন পনর হাজারেরও বেশী শিখ বাস করত। আমেরিকার শ্রমিকদের তুলনায় এদের মজুরি ছিল কম। সুতরাং এদের চাহিদা ছিল বেশী। এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকান শ্রমিকদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। প্রথম দিকে ভারতীয় শ্রমিকদের ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু ভারতীয়দের এ অলীক স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে গেল। ১৯১৪ সালের ১৫ই মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই আমেরিকায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে মার্কিন সরকার লালা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করে। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। কানাডা সরকারও এমিগ্রেশন আইন করে ভারতীয় শ্রমিকদের কানাডা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এক ধনী শিখ ব্যবসায়ী এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ৩৭২ জন শিখকে নিয়ে কানাডায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কানাডা সরকার তাঁদের সেখানে অবতরণ করতে দিলেন না। শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনী এবং সৈন্যবাহিনী প্রয়োগ করে ভারতীয় জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এ সত্বেও বিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করায় তাঁরা ঘোর ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে কানাডা ত্যাগ করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর জাহাজ যখন বজবজে ফিরে এল আরোহীরা উত্তপ্ত এবং অগ্নিগর্ভ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করবার জন্য ১৯০৫ সালে লণ্ডনের হাইগেট অঞ্চলে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে এক সমিতি ছিল "ভারতীয় স্বাধীনতা সমর্থক আন্তর্জাতিক

সমিতি"। এর সভাপতি ছিলেন চম্পকরমণ পিল্লাই। ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাদাম কামা, সর্দার সিং রানা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সাভারকার প্রভৃতি। আমেরিকায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে বলেন, "১৯০৭ সালে আমেরিকার কালিফোনিয়া সহরে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, তারকনাথ দাস, অধরচন্দ্র লস্কর প্রভৃতি মিলে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘ আমেরিকায় ভারতীয়দের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। ১৯০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেণ্টো শহরে এবং অরিগণ ষ্টেটের পোর্টল্যাণ্ডে স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়। সঙ্ঘ 'Free Hindusthan' নামে একখানি পত্রিকাও প্রচার করে। ১৯১০ সালে সোহন সিং ভাখনার এর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে হরদয়াল এবং ভাই পরমানন্দ আমেরিকায় আসেন। এর পরে ১৯১৩ সালের ১৩ই মার্চ অগষ্টকিনে সোহন সিংয়ের কাঠের কারখানায় ভারতীয়রা মিলে ১লা নভেম্বর সঙ্ঘের পূর্বনাম পারবর্তিত করে "আমেরিকান হিন্দ সমিতি" করেন। "গদর" নামে একখানি পত্রিকাও উর্দু, হিন্দী, গুরুমুখী এবং আরবি ভাষায় প্রকাশিত হবে স্থির হয়।

কিন্তু ১লা নভেম্বর প্রথম সংখ্যা শুধু উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবী দল 'গদর' পত্রিকা অবলম্বনেই গড়ে উঠতে থাকে। এজন্য এদের দলও গদর দল নামে পরিচিত হয়। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই গদর দলের লক্ষ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে সাক্রামেণ্টো শহরে ভারতীয় বিপ্লবীদের এক সমাবেশ হয়। লালা হরদয়াল ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে তাঁদের ভারতে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন।

কিন্তু এর আগেই ১৯১৩ সালের ১লা নভেম্বর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী নিয়ে 'গদর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যা গদর পত্রিকা ছিল এইরূপ :

তোমার নাম কি—বিদ্রোহ।

তোমার কাজ কি ?—বিদ্রোহ।

কোথায় বিদ্রোহ?—ভারতে।

কেন বিদ্রোহ? —বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় অত্যাচার ভারতবাসীর কাছে অসহ্য হয়েছে।

প্রতি সংখ্যা গদর পত্রিকায়ই এক প্রকার বিজ্ঞাপন থাকত—

চাই—ভারতে বিদ্রোহের জন্য উৎসাহী ও সাহসী সৈন্য।

বেতন—মৃত্যু। পুরস্কার—শহীদী।

বৃত্তি—স্বাধীনতা। রণক্ষেত্র—ভারত।

প্রতি সংখ্যা গদর পত্রিকায়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ থাকত।

রাসবিহারী দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী। তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য ১২৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য রাসবিহারীর নাম তখন ইউরোপ-আমেরিকার বিপ্লবী মহলে সুপরিচিত। অপর দিকে বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে বড় বড় চারটি ষড়যন্ত্র মামলা অনুশীলন বিপ্লবীদের বহির্বিশ্বে সর্বত্র পরিচিত করেছে। ১৯০৭ সাল থেকে আরম্ভ করে সরকারের সঙ্গে তাঁদের একটা সংগ্রাম চলছে। তাই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতেই গদর বিপ্লবীদের প্রতি নির্দেশ হল, তাঁদের অবিলম্বে ভারতে ফিরে গিয়ে রাসবিহারীর নেতৃত্বে এবং অনুশীলন বিপ্লবীদের সহযোগিতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে। আদেশ পাওয়া মাত্র দলে দলে গদর বিপ্লবীরা ভারতে আসতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এঁদের সংখ্যা দাঁড়াল চার হাজারেরও বেশী। এঁরা সকলেই বিদ্রোহের জন্য সমর্পিত-প্রাণ। অধিকাংশের সামরিক শিক্ষাও ছিল। দেশে থাকতে তাঁরা সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন। বিদেশে যে অর্থ উপার্জন করেছেন তাও নিয়ে এসেছেন বিদ্রোহের কাজের জন্য। দেশে এসেই তাঁরা বাঙালী বিপ্লবীদের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু ভারত রক্ষা আইনে ব্যাপক ধরপাকড়ের মধ্যে তাঁরা বিপ্লবীদের কোন সন্ধান পেলেন না। যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরাও ফেরার। গদর নেতারা Bengali পত্রিকা অফিসে সুরেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে অনুশীলন বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। দিল্লীর বিপ্লবী দলের পাঞ্জাবে কিছু সংগঠন ছিল হরদয়ালের সূত্রে। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত গদর বিপ্লবী নেতা কর্তার সিং সারাভা এবং বিষ্ণু গণেশ পিংলে ঐ সূত্রে কাশীতে রাসবিহারীর সন্ধান আবিষ্কার করলেন। কিন্তু রাসবিহারী পাঞ্জাবের অবস্থা না জেনে তাঁদের কোন কথা দিলেন না। প্রতুল গাঙ্গুলীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শচীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে পাঠালেন। শচীন্দ্রনাথ ফিরে এসে অনুকূল সংবাদ দিলে তিনি বিদ্রোহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে বাসস্থান কাশী থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত করলেন। এই ভাবে অনুশীলন-চন্দননগর-কাশী-দিল্লী-গদর বিপ্লবীদের বিরাট সংগঠন নিয়ে রাসবিহারী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এদিকে কামাগাটা-মারু ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ সচেতন হয়েছেন। বিদেশাগত শিখদের গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ করা হচ্ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ১৯১৫ সালের মধ্যে ৮০০০-এর কিছু বেশী

গদর বিপ্লবী নানা ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে এসেই তাঁরা নানা প্রকার ছোটখাট বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দেন। ১৯১৪ সালের ১৬ই অক্টোবর চৌকিমান রেল ষ্টেশন আক্রান্ত হল। আক্রমণকারীরা রেলের টাকা-কড়ি লুঠ করে নিলেন। ২৭শে নভেম্বর বিদ্রোহীরা মোগা মহকুমা ট্রেজারি লুণ্ঠনের চেষ্টা করেন। পুলিশ বাধা দিলে দারোগা এবং একজন কনেষ্টবল নিহত হল। এই ঘটনায় দুজন বিপ্লবীও নিহত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত ইংলণ্ডকে যে সৈন্য সরবরাহ করে তার মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ ছিল পাঞ্জাবী। রাসবিহারী বুঝেছিলেন এদের উপরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সুতরাং এদের আনুগত্যে ঘুণ ধরানোই হল রাসবিহারীর প্রধান কাজ। তিনি পূর্ব সীমান্তে আসাম-বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার পর্যন্ত এক সঙ্গে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন সৈন্যব্যারাকে সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা চলতে লাগল। এ কাজের ভার নিলেন কর্তার সিং সারাভা। সারাভার অধীনে শত শত তরুণ কর্মী সীমান্তের বান্নু থেকে যুক্ত প্রদেশের কাশী পর্যন্ত শত শত মাইল সাইকেলে অতিক্রম করে সৈন্যদলকে বোঝাতে লাগলেন, ব্রিটিশের জন্য রক্তপাত না করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলি দেওয়াই শ্রেয়। বিপ্লবী তরুণেরা সৈন্যের ছদ্ম-বেশে সেনানিবাসে প্রবেশ করতেন এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে সৈন্যদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। এইরূপে ছাব্বিশটি সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুতি দিল যে, বিপ্লব আরম্ভ হলেই তারা ব্রিটিশের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিবে।

চরম মুহূর্ত দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। ইউরোপের যুদ্ধ তখন জার্মানির অনুকূলে। বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হল লাহোরে। অমৃতসরে একটা গুপ্ত ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হল। দুইটি কারখানায় দিনরাত বোমা তৈরী চলতে লাগল। স্বাধীন ভারতের পতাকা তৈরী হল; যুদ্ধ ঘোষণার খসড়াও রচিত হল। স্থির হল, বিপ্লব আরম্ভ হলেই বিদ্রোহী সৈন্যরা সেনানিবাসের অস্ত্রাগার এবং বারুদখানাগুলি দখল করে ফেলবে। প্রথমেই ট্রেজারিগুলি লুণ্ঠন করে কারাগার থেকে বিপ্লবী এবং অন্যান্য বন্দীদের মুক্ত করা হবে। বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির অধীনে ঐ সময় মিলিত হয়েছিল। এ জন্য যতীন্দ্রনাথকে কাশীতে ডেকে রাসবিহারী তাঁকে আসন্ন সংগ্রামে যোগ দিবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুতির জন্য দুই মাস সময় চাইলেন; এদিকে পাঞ্জাব তখন অগ্নিগর্ভ। দুই মাস সময় দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং স্থির হল,

যতীন্দ্রনাথ বিপ্লব আরম্ভ হলে পরে যোগ দেবেন। রাসবিহারী ঘোষণা করলেন, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সর্বত্র এক যোগে সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হবে।

আসন্ন বিপ্লবের জন্য সবই প্রস্তুত। হঠাৎ জানা গেল, গভর্ণমেণ্ট অভ্যুত্থানের দিন সম্পর্কে খবর পেয়েছে। রাসবিহারী দিন এগিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী করলেন। বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রে নূতন তারিখের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই পরিবর্তনের সংবাদও পুলিশ পেয়ে গেল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে এবং পরদিন প্রত্যুষে পাঞ্জা.বর বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী আমদানি করা হল। সেনানিবাসে অস্ত্রাগারের পাহারায় ইংরেজ সৈন্যদের নিযুক্ত করা হল। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে সৈন্যদল ও পুলিশের পাহারা বসল। রাজপথে সৈন্যদল টহল দিতে লাগল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে পুলিশ বিদ্রোহীদের চারটি কেন্দ্র ঘিরে ফেলল। নেতৃস্থানীয় সাতজন গ্রেপ্তার হলেন। বহু অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ল। ক্রমে অন্যান্য স্থানেও বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন।

যে সমস্ত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হল তাঁদের নয়টি দলে বিভক্ত করে অভিযুক্ত করা হল। প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হল ২৭শে মার্চ। শুনানী হয় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। আসামী ছিলেন সোহন সিং ভাপনার, ভান সিং, নিধান সিং কেহর সিং, কর্তার সিং সারাভা, পৃথ্বী সিং প্রমুখ একষট্টি জন। ১৩ই সেপ্টেম্বর বিচারক রায় দিলেন। ৬ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল; তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। ছাব্বিশ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হল। তিন জন কম দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অন্যান্যদের খালাস দিয়ে জেল গেটে আবার গ্রেপ্তার করে দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত করা হল। দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন চুয়াত্তর জন। তৃতীয় মামলায় আসামী ছিলেন বার জন। সিডিসন কমিটির মতে, নয়টি মামলায় শেষ পর্যন্ত আঠাশ জনের ফাঁসি হয়। একুশ জন মাত্র বেকসুর খালাস পান। অবশিষ্টরা বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। যে সমস্ত সৈনিক বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার হল। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রাসবিহারী ছদ্মনামে ১৯১৫ সালের ১২ই মে ভারত ত্যাগ করে জাপানে চলে যান।

এই বিদ্রোহের চেষ্টা শুধু যে ভারতের অভ্যন্তরে হয়েছে তা নয় এবং বিদ্রোহ যে সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা-ও নয়। স্থির ছিল, ব্রহ্মদেশে এবং সিঙ্গাপুরে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ছিল তারাও বিদ্রোহ করবে। সিঙ্গাপুরে পঞ্চম

পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে সাতদিন পর্যন্ত কেল্লা দখল করে রাখে। শিখ ও পাঠান সৈন্য নিয়ে এই পঞ্চম বাহিনী গঠিত ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুই-তিনদিন আগেই সিঙ্গাপুর দুর্গে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সৈন্যদের মধ্যে আদেশ পালনে শৈথিল্য দেখা দেয়। সুবেদার মেজর ডাণ্ডি খাঁ কুচকাওয়াজে উপস্থিত হলেন না। কেউ কেউ বাজারে চলে গেলেন। সৈন্যদের এই আচরণে শ্বেতাঙ্গ অফিসারগণ বিক্ষুব্ধ হলেন। ডাণ্ডি খাঁকে অফিসে ডেকে পাঠালেন তাঁরা। ডাণ্ডি খাঁ অফিসে প্রবেশ করে অফিসারদের অভিবাদন করলেন না। অফিসাররা ক্রুদ্ধ হলেন। একজন চীৎকার করে বললেন, "শূয়ার কা বাচ্চা প্যারেডমে ক্যাঁও নাহি আয়া।" বলা মাত্র ডাণ্ডি খাঁ রিভলভার বের করে দুজন অফিসারকেই হত্যা করলেন। বাইরে এসে ভারতীয় সৈন্যদের হুকুম দিলেন "fall in"। অস্ত্রাগার দখল করে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এর পরে আরম্ভ হল শ্বেতাঙ্গ হত্যা। কেল্লার সমস্ত ইংরেজ অফিসার-কেই হত্যা করা হল, শহরেও শ্বেতাঙ্গ হত্যা চলতে লাগল। শহর ভারতীয় সৈন্য-দের দখলে এল। তাঁরা স্থির করলেন, নিকটবর্তী জহরবারু রাজ্যের নবাবকে সিঙ্গাপুরের শাসক বলে ঘোষণা করা হবে। নবাব সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেন। কিন্তু সৈন্যদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে খেতে বসতেই তাঁদের ধরিয়ে দিলেন। ভার-তীয় সৈন্যদের ও অফিসারদের সিঙ্গাপুর জেলে বন্দী করা হল। কেল্লা নেতৃত্বহীন হয়েও আত্মসমর্পণ করল না। পরদিন এক রুশ জাহাজ এসে কেল্লা দখল কর-বার চেষ্টা করল। কিন্তু কেল্লার সৈন্যদের গুলীবর্ষণে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। রুশ সৈন্যরা প্রায় সকলেই হত বা আহত হলেন। এর ফলে কেল্লা আরও দুদিন বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। সপ্তম দিনে একখানি জাপানী জাহাজ এসে কামান দাগিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এই প্রবল আক্রমণ বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ করতে পারলেন না। তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ঐদিনই এক ব্রিটিশ জাহাজ এসে জাপানীদের হাত থেকে কেল্লার দখল নিল। এর পরে আরম্ভ হল বিদ্রোহীদের বিচার। সামরিক আদালতে বিচার হল লোকচক্ষুর অন্তরালে। ঢোল শহরতে শহরে জানিয়ে দেওয়া হল বিদ্রোহীদের বিচারের হুকুম শোনানো হবে, জনসাধারণ তা দেখতে পাবে পরিখার ওপার থেকে। ছয়জন বন্দীকে এনে সার করে দাঁড় করানো হল। তাঁদের সামনে দাঁড়ালো বন্দুক তাক করে কুড়ি পচিশ জন গোরা সৈন্য। গোরার কণ্ঠে সহসা ধ্বনিত হল, "Thus justice is done! ready! fire!" সহসা বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জন করে উঠল; নিমেষমধ্যে ছয়জন বন্দী ভূতল শায়ী হলেন। এর চারদিন পরে আবার এইরূপে বাইশ জনের বিচার শোনানো-

হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিদ্রোহী ভাণ্ডি খাঁও। এবারে প্রায় একশোটি রাইফেল গর্জে উঠল; সকলেই পড়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে জনতা সহ্য করতে পারছিল না। তারা কেউ ডাকছিল, 'খোদা, 'খোদা', কেউ ডাকছিল ভগবানকে, কেউ বা মূর্ছা গেল। এর পরে আরও কয়েকবার এই নিষ্ঠুর বিচারের প্রহসন চলেছিল। প্রায় একশত বন্দী ভারতীয় সৈনিক ইংরেজের প্রতিহিংসার বলি হলেন। এইভাবে ভারত থেকে দূরে সমাপ্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সেদিন আত্মবলি দিলেন কেউ তাঁদের কথা জানলো না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জার্মান অস্ত্রসাহায্যে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট রাত্রি প্রায় এগারটায় ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর কিছুদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। বিপ্লবী বীর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সময় প্যারিসে ছিলেন। ফ্রান্সে বসে যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই এপ্রিলের প্রথম ভাগেই তিনি জার্মানীর হাল শহরে চলে গেলেন। ত্রিপুরার বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্যও এই সময় হালে ছিলেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাও তেইশে এপ্রিল প্যারিস ত্যাগ করে জেনেভা গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সর্দার সিং রানা এবং ম্যাডাম কাম ফ্রান্সেই ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই তাঁরা বন্দী হলেন। হালে বসে বীরেন্দ্রনাথ এবং অবিনাশচন্দ্র ভারতের পক্ষে জার্মানীর অনুকূলে এক বিবৃতি প্রচার করলেন। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় বিবৃতিটি প্রকাশিত হল। কিন্তু জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া মিলল না। জার্মান পররাষ্ট্র সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ হেলমুথ ভেলব্রুকের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের এক সাক্ষাৎ হয়েছিল আগে। তাঁর আত্মীয়া মিসেস সিমনকে দিয়ে তাঁর কাছে তার করা হল—"তুমি কি তোমার স্বরাষ্ট্রসচিব পিতৃব্যকে ভারতীয় বিপ্লবী এবং আমার প্রিয় ভট্টের বন্ধু ভারতের হের চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা করতে বলতে পার না?" অপরাহ্নে তারের উত্তর এল, "তোমাদের চট্টোপাধ্যায়কে বার্লিন পররাষ্ট্র অফিসে ব্যারন বার্থিমের নিকট পাঠিয়ে দাও, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" পরদিন সকালেই বীরেন্দ্রনাথ বার্লিন রওনা হয়ে গেলেন। সেদিন ৩১শে আগষ্ট। বিকালে বীরেন্দ্রনাথের ফোন এল, "অবস্থা আশাতীত উৎসাহব্যঞ্জক। সকালে ফিরছি।" ১লা সেপ্টেম্বর বীরেন্দ্রনাথ বার্লিন থেকে ফিরে এলেন। তিনি জানান, প্রথম সাক্ষাতেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যারন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। হালের সমস্ত ব্যয় মিটিয়ে বার্লিনে চলে যাবার জন্য তিনি বীরেন্দ্রনাথের হাতে পাঁচশত মার্ক দেন। ঐদিনই রাত্রি দশটায় দুই বন্ধু বার্লিন যাত্রা করলেন। পরদিন সোয়েনবার্গ পল্লীতে তাঁদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। বেলা এগারটার সময় ব্যারন ওপেন-হাইমের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। ভারত কি কি শর্তে এই যুদ্ধে জার্মানীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত বীরেন্দ্রনাথ তার একটি তালিকা ওপেনহাইমের হাতে দিলেন। আটটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্তই ছিল—"ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য

জার্মানী প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ সরবরাহ করবে। প্রয়োজন হলে সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষও সরবরাহ করবে।"

এর পরে জার্মানীতে এবং অন্যান্য স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হল। ধীরেন সরকার, কেরসাস্প, এস. এস. মারাঠে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই, ডঃ বিষ্ণু সুকতাঙ্কর, ডঃ যোশী প্রভৃতি একে একে এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ সেন অনুশীলন দলভুক্ত ছিলেন। ডঃ হার্বার্ট মুলারকে ভারতীয় বিপ্লবী এবং জার্মান সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হল। ভিল মার্স্ডফের্ মুলারের গৃহই হল ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র। শর্ত অনুযায়ী কমিটি গঠিত হল। কমিটির নাম হল "Den Scloe Verein Der Freundle Indien" (ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি)। কমিটির সভাপতি হলেন আলবার্ট বেলিল, সহ-সভাপতি হলেন ব্যারণ ওপেনহাইম এবং ডঃ সুকতাঙ্কর, সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন শ্রীধীরেন সরকার। পরে এই সমিতি বার্লিন কমিটি নামে পরিচিত হয়। ১৯১৫ সালের মধ্যভাগে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও বার্লিনে এসে কমিটিতে যোগ দেন। কমিটির পক্ষ থেকে ভিনসেন্ট হাইস নামে জনৈক ইন্দোনেশীয় জার্মানকে কমিটির পক্ষ থেকে বাটাভিয়া পাঠানো হল। নির্দেশ দেওয়া হল, তিনি সেখান থেকে আন্দামান আক্রমণের ব্যবস্থা করবেন। অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় বিপ্লবীদের জানাবার জন্য শ্রীরামপুরের জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর গুহকে ভারতে পাঠানো হল। তাঁরা ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে আসেন। কেদারবাবু এসে অস্ত্র সাহায্য সম্পর্কে রাসবিহারীকে এবং জিতেন্দ্রনাথ যতীন মুখার্জীকে জানালেন। এই সূত্রে যতীন্দ্রনাথের নিকট কিছু অর্থও আসে। যতীন্দ্রনাথ জার্মান অস্ত্র সাহায্যের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশে বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করেন। রাসবিহারীর প্রচেষ্টা তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিনও ধার্য হয়েছে। সুতরাং রাসবিহারী অনিশ্চিত জার্মান অস্ত্রের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে সম্মত হলেন না। তিনি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা সফল করে তুলবার কাজে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। জিতেন্দ্রনাথ বা কেদারেশ্বরবাবু কেউই জার্মান অস্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সংবাদ নিয়ে আসেন নি। এই অস্ত্র সাহায্য সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "১৯১৫ সালের মে মাসে বার্লিনে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভারতে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ পাঠানো হয়েছে। তিনখানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর ধরে যাচ্ছে, আর দুইখানি যাচ্ছে সুয়েজখাল

ধরে। কিন্তু এর মধ্যে একটি জাহাজ ভুল করে সেলিবিস দ্বীপে প্রবেশ করে। ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট সে জাহাজ আটক করে। আরেকখানি জাহাজ "অ্যানিনারসেন" ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে মার্কিন সরকার কর্তৃক ধৃত হয়। অন্য জাহাজগুলির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। ডক্টর খানচাঁদ বর্মা বলেন যে, অস্ত্রপূর্ণ একটি জাহাজ করাচী বন্দরের নিকট ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ডুবিয়ে দিয়েছে। মানবেন্দ্র রায় বলেন যে, এ বিষয়ে জার্মান গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ আন্তরিকতা ছিল না। অস্ত্রপূর্ণ কোন জাহাজ ভারতের দিকে আসেনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জার্মান অস্ত্র-সাহায্যে ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নি। যুদ্ধশেষে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪ দফার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার উল্লেখ করার চেষ্টা হয়। এ চেষ্টা করেন সানফ্রানসিসকো থেকে সুরেন্দ্রনাথ কর। তা সত্ত্বেও ভারতে অস্ত্র প্রেরণের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে এই জন্য বার্লিন কমিটি যবদ্বীপের ন্যাশনালিষ্ট পার্টির নেতা ডক্টর দাউস ডেকারের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি এই সময় ইয়োরোপে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলে পূর্ণভাবে যোগ দেন। কিন্তু যবদ্বীপে যাবার পথে ইংরেজের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে সানফ্রানসিসকো মামলায় অভিযুক্ত হন। এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে তিনি সমস্ত কথা বলে দেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-জার্মান ষড়-যন্ত্রের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হয়েছে বলা চলে না। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানী যখন জয়লাভ করছিল তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের বিপর্যয় আরম্ভ হল। তখন তাদের আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে পরিণত হল। এর জন্য হয় তো তাদের পক্ষে ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যে চেষ্টা হয়েছিল ব্যর্থতা সত্ত্বেও তা-ই ভারতের পক্ষে গৌরবময়। কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন, ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের এই দ্বিতীয় পর্বে যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার সঙ্গে অনুশীলন যোগ দেয় নাই। কিন্তু চারটা ষড়যন্ত্র মামলার পরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যে বিপর্যয় এনে দিয়েছিল তা একবার ভেবে দেখা দরকার। আর যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব প্রচেষ্টা ছিল আঞ্চলিক। জার্মান অস্ত্র না আসায় এই আঞ্চলিক বিপ্লবও কার্যে পরিণত হয় নাই। যদি জার্মান অস্ত্রশস্ত্র আসত এবং বিপ্লব আরম্ভ হত তাহলে অনু-শীলনের পক্ষেও নীরব হয়ে বসে থাকা সম্ভব হত না। তাছাড়া এই অভিযোগটা একমাত্র অনুশীলনের বিরুদ্ধে। সম্মিলিত সংহতির অন্য কারো বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নাই। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যতীন মুখার্জী আত্মদান করেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের

৯ই সেপ্টেম্বর। তার আগে ২৬শে জুন বেনারস-ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে শচীন সান্যাল গ্রেপ্তার হন। অনুশীলনের তখনকার নেতা এবং রাসবিহারীর সহকর্মী গিরিজা দত্তও এই সময়ে গ্রেপ্তার হন। তখনও জার্মান সাহায্য আসে নাই। রাসবিহারী অস্ত্র আনবার জন্য জাপানে গিয়েছেন। সুতরাং এই সময়ে মিলিত সংহতি ভেঙে অনুশীলনের পক্ষে যতীন মুখার্জীর প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়া সম্ভব হত কি না তাও একবার বিবেচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা (১৯৪৭ ইং) প্রবর্তক থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "রাসবিহারী জাপান মন্ত্রীদের সহায়তায় জার্মানীর কাইজারের সহিত পরিচয় করিলেন। জাপান এই সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার রাষ্ট্রনায়কগণের ভারত হইতে ইংরেজ রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা ছিল। জাপানের সাহায্যে কাইজারের অর্থে দুইটি অস্ত্রসজ্জিত জাহাজ ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেই অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ সুন্দরবনের অদূরে আসিল। বংশী-ধ্বনি করিলেই বিপ্লবীরা অস্ত্র তীরে উঠাইবেন—এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু হংকং বন্দরে একজন ইসলামধর্মী সহকর্মী কর্তৃপক্ষকে এ কথা জানাইয়া দিল। ফলে সুন্দরবনে পৌঁছিবার আগেই জাহাজ তল্লাসী হইল এবং বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। অস্ত্র সরবরাহ সম্বন্ধীয় নির্দেশপত্রখানিও পুলিশের হস্তগত হইল। বাংলায় আবার ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া গেল।"

সুতরাং রাসবিহারীর প্রচেষ্টা যে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়েছে তা নয়। এজন্য সম্মিলিত দলের মধ্যে কোন একটি দলের দল ভেঙে অন্য কোন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতা ছিল না। তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জার্মান অস্ত্রসাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লব যদি সম্ভব হত তবে শুধু অনুশীলন নয় সম্মিলিত দলের অন্যান্য অংশীদার চন্দননগর, কাশী, দিল্লী এবং গদর সবাই তাতে যোগ দিতেন।

ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের এই দ্বিতীয় পর্বে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং তাঁর সহ-কর্মীদের আত্মদানই সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের আত্মদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯১৩ সালের বর্ষায় দামোদর বাঁধ ভেঙে যায়। জনগণের দুর্গতি দূর করবার জন্য মাখনলাল সেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, মতিলাল রায়, শচীন সান্যাল এবং উত্তর বঙ্গের যতীন রায় প্রভৃতি বিপ্লবিগণ মিলিত হন। এই সময় দলনির্বিশেষে সকল বিপ্লবীর একটা মিলিত প্রচেষ্টার কথা হয়।

উত্তরপাড়ার এক শিব মন্দিরে গোপন সভার অধিবেশন বসলো। মাখন বাবু, যতীন্দ্র নাথ, নরেন ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ এবং অনুশীলনের নরেন সেন এবং চন্দননগরের মতিলাল রায় ও শ্রীশ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবী শক্তি পুনর্গঠনের ভার নিলেন। এ সম্পর্কে মতিলাল বলেন, "স্থির হইল বিপ্লব শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে এবং বাংলার দশ সহস্র যুবক প্রস্তুত করার ভার অনুশীলন সমিতির উপর থাকিবে। সহস্র বোমা নির্মাণের ভার লইবে চন্দননগর। অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা এবং স্থানে স্থানে বিপ্লবী সংঘ স্থাপনের ভার বণ্টন করিয়া নেওয়া হইল।"

বিপ্লবী দলসমূহ পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীকে একত্র করার কাজে মন দিলেন। এদের মধ্যে ছিল মাদারিপুরের পূর্ণ দাসের দল, বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দল, সতীশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে খুলনার দল, হেমেন্দ্র কিশোর আচার্যের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের দল, বিপিন গাঙ্গুলীর দল এবং উত্তরবঙ্গের যতীন রায়ের দল। এই সময় বাইরে থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গদর বিপ্লবীদের আগমনে রাসবিহারীকে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হল এবং অনুশীলন ও চন্দননগর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। যতীন্দ্রনাথকে এই প্রচেষ্টায় মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রাসবিহারীর ব্যর্থতার পরে জার্মান অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যতীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় কার্যের প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং সে অস্ত্র না আসাতেই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এসে সংবাদ দেন যে, মেভারিক জাহাজে অস্ত্র আসছে, করাচীর উপকূলে ঐ অস্ত্র নামিয়ে দেবে; কিন্তু ঐ অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথের কোন সংগঠন না থাকায় সেখানে অস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পাঠানো হল অস্ত্রপূর্ণ জাহাজখানি সুন্দরবনে আনার জন্য। নরেন্দ্রনাথ সাংহাইতে গিয়ে জার্মান কনসালকে একথা জানালেন। অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ সুন্দরবনে আনার ব্যবস্থা হল। জার্মান গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে কিছু টাকাও যতীন্দ্রনাথের হাতে আসে। এই সম্পর্কে কলকাতার হ্যারী অ্যাণ্ড সান্স তল্লাসী হয়। ব্যবস্থা হয়েছিল যে মেভারিক জুন মাসে অস্ত্রশস্ত্র সুন্দরবনে নামিয়ে দিবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে মেভারিক এল না। ৭ই আগষ্ট হ্যারি অ্যাণ্ড সান্স তল্লাসী হল। এদিকে ব্যবস্থামত যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারজন সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত এবং যতীশ পালকে নিয়ে বালেশ্বর রওনা হলেন। কাপ্তিপোদা নামক স্থানে বাসস্থান হল যতীন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন এবং নীরেন্দ্রের। চিত্তপ্রিয় ও যতীশ পালের থাকার

স্থান হল আরও এগার মাইল দূরে তালদিহায়।

কলকাতার হ্যারী অ্যাণ্ড সান্স থেকে পুলিশ বালেশ্বরে বিপ্লবী কেন্দ্রের সন্ধান পায়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডেনহাম ও টেগার্ট বালেশ্বর রওনা হয়ে যান। বালেশ্বর তল্লাসী করে পুলিশ কাপ্তিপোদার সন্ধান পায়। ৭ই সেপ্টেম্বর টেগার্ট এবং কিলবি সেখানে উপস্থিত হলেন। যতীন্দ্রনাথ ৫ই তারিখে কলকাতা পুলিশের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন। চিত্তপ্রিয় ও যতীশ পালকে আনবার জন্য তিনি অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে তালদিহার দিকে রওনা হয়ে যান। কাপ্তিপোদায় পুলিশ বিপ্লবী-দের পেল না। তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিল যে এ অঞ্চলে ডাকাত এসে আড্ডা করেছে। ফলে গ্রামবাসীদের নিয়ে পুলিশ বিপ্লবীদের অনুসরণ করে তালদিহার দিকে চলল। পথিমধ্যে বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ পেয়ে রাজমহান্তি এবং সুদামগিরি তাদের পথ রোধ করল। মনোরঞ্জন তাদের গুলী করলেন, রাজমহান্তির মৃত্যু হল। সুদামগিরিও আহত হল। বেলা দুটার সময় বালেশ্বরে এই সংবাদ পৌঁছুল। বিপুলসংখ্যক পুলিশ দুদিক থেকে অগ্রসর হয়ে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলল। যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করবেন, স্থির করলেন। তিনি একটা শুকনো পুকুরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন।

পুলিশ এগিয়ে আসতে লাগল। যতীন্দ্রনাথই প্রথমে গুলী করলেন। পুলিশ পক্ষ রাইফেলের গুলীতে উত্তর দিল। পাঁচ বীর অনবরত গুলী চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুলিশ পক্ষে বহু হতাহত হল। হঠাৎ একটা রাইফেলের গুলি এসে চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ ভেদ করল। এর পরে আরেকটা গুলী এসে যতীন্দ্রনাথের উরুদেশে বিদ্ধ হল। যতীন্দ্রনাথ এবারে যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। তিনি সাদা নিশান উড়িয়ে দিলেন। তখন চিত্তপ্রিয় নিহত। যতীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক আহত। যতীশ পালও সামান্য আহত। এই অবস্থায় বিপ্লবীরা ধৃত হলেন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল নয়টার সময় হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল।

১লা অক্টোবর বালেশ্বরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মনোরঞ্জন, নীরেন এবং যতীশের বিচার আরম্ভ হল। ১১ই অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল রায় দিল। মনোরঞ্জন ও নীরেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। যতীশকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। মনোরঞ্জন ও নীরেন হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সাহায্যে বিপ্লব প্রচেষ্টা বহির্ভারতীয় মহলেও পরিত্যক্ত হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন, জার্মানীর ইচ্ছা থাকলেও ভারতকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পরে বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবিগণ রুশিয়ার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার দিকে মন দিলেন।

বিপ্লবোত্তর রুশিয়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, এ জন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সময় সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে মিলনে উৎসুক হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই। বিপ্লবের পরে সমাজতন্ত্রী রুশিয়াও তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তাই মৌখিক সাহায্য প্রদর্শন করলেও তাদের পক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় কার্যকরী কোন সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই। এক কথায় ভারত তার স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় সোভিয়েট রুশিয়ার কাছ থেকেও কোন সাহায্য পায় নাই। কিন্তু এ সত্ত্বেও ভারতীয় বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টার মূল্য কম নয়। জনৈক মার্কিন মনীষী ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন, "আজ বিপ্লব প্রচেষ্টা মাত্রই আন্তর্জাতিক, কিন্তু আমার মনে হয় ভারতই এই পথ প্রথম দেখিয়েছে। গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক থেকে এ ধরণের প্রচেষ্টা এর আগে আর হয়নি।' এই মনীষীর নাম মিষ্টার স্পেলম্যান।

সপ্তম অধ্যায়

সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার পরে

১৯০৫-৬ সালে যখন ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় ঐ সময়ই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপিত হচ্ছিল। পুলিনবাবু চেষ্টা করে ঐ সময় সমিতির কিছু কর্মীকে আসামে পাঠিয়ে রেলে তাঁদের চাকুরির ব্যবস্থা করেন। সমিতির বিপদে আপদে কর্মীরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল ভারতরক্ষা আইনে বিপ্লবীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার চলতে লাগল। বাংলাদেশে আইন জারী হল যে, সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকলে কারো বাড়ী ভাড়া নেওয়া বা দেওয়া বে-আইনী। সুতরাং বিপ্লবীদের পক্ষে বাড়ী ভাড়া পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। ফলে আসামেই বিপ্লবীদের স্থান করে নিতে হল। অনুশীলনের বিপ্লবীরা আসামে চারটি বাড়ী ভাড়া করলেন। ফেরারী বিপ্লবীরা এখানেই স্থায়ীভাবে থাকতেন। বাংলা দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে আবার গিয়ে আসামে গৌহাটিতে আশ্রয় নিতেন। নলিনী ঘোষ দালান্দা হাউস থেকে পালিয়ে প্রথমে চন্দননগরের মতিবাবুর নিকট চলে এলেন। এর পরে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন গৌহাটিতে সমিতির গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে। এই সময় অনুশীলনের ফেরারী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন নলিনী ঘোষ, নলিনী বাগচী, সতীশ পাকড়াশি, কৃষ্ণলাল সাহা, প্রভাস লাহিড়ী, মণীন্দ্র রায়, নরেন ব্যানার্জী, প্রবোধ দাসগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন বল, তারিণী মজুমদার, অমৃত সরকার, নিকুঞ্জ পাল, প্রবোধ বিশ্বাস, গোবিন্দ কর, শশীশেখর সান্যাল, জিতেশ লাহিড়ী প্রভৃতি। এঁদের জন্যই গৌহাটিতে চারটি বাড়ী ভাড়া হয়েছিল। প্রথমটি আটগাঁও হাউস, জেলখানার পূর্ব দিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাসা ছিল উজান বাজারে এবং চতুর্থ বাসা ছিল ফ্যান্সী বাজারে। স্থায়ী ফেরারী বিপ্লবী ছাড়া অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখার্জী, যুগান্তরের সতীশ চক্রবর্তীও এখানে এসে থাকতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন কলকাতায় কৃষ্ণ সাহা গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁর কাছ থেকে এক স্বীকারোক্তি আদায় করল। স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ গৌহাটির আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের বিষয় জানতে পারে। বাংলা পুলিশের জমাদার ওয়েদার এবং লোম্যান তৎক্ষণাৎ ছুটলেন গৌহাটি অভিমুখে। ১৯১৮ সালের ৯ই জানুয়ারী রাত তিনটেয় বিপুল বাহিনী নিয়ে তাঁরা ঘিরে ফেললেন আটগাঁও হাউস। বিপ্লবীরা পালা করে

পাহারা দিতেন সমস্ত কেন্দ্রেই। আটগাঁও হাউসে রাত একটা পর্যন্ত পাহারা ছিল প্রভাস লাহিড়ীর। পরবর্তী পাহারা মণীন্দ্র রায়ের। মণিবাবু হঠাৎ এসে সবাইকে জাগিয়ে তুললেন—পুলিশ এসেছে, সবাই প্রস্তুত হও। লাফিয়ে উঠলেন নলিনী ঘোষ এবং পেছনে পেছনে অন্য সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখা গেল যে, প্রায় ১৫০ জন মিলিটারী পুলিশ এবং ২৫।৩০ জন অফিসার বাড়ীখানাকে ঘিরে আছে।

অবস্থা দেখে নলিনীকান্ত বুঝলেন, সম্মুখ-সংগ্রাম করে পুলিশব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে হবে, নতুবা মৃত্যুবরণ। নলিনীবাবুই প্রথমে গুলী ছোড়েন। প্রথম গুলীতেই একজন 'মর গিয়া' বলে ভূপতিত হল। এর পরে দুই দলে অনবরত গুলীবিনিময়। পুলিশের অসংখ্য রাইফেলের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মাত্র ৪টি রিভলভার। একটা রাইফেলের গুলী এসে প্রভাসবাবুর উরুদেশে বিদ্ধ হল। রক্তে পরিধেয় বস্ত্র ভিজে গেল। কিন্তু তবুও তিনি গুলী চালিয়ে যাচ্ছেন। নলিনীবাবু এই সময়ে বলে উঠলেন, "আমরা তো পাঁচজন, এখানে চারজন কেন?" তিনি গুলী বন্ধের নির্দেশ দিলেন। অপর পক্ষে পুলিশও থেমে গেল। দেখা গেল দেয়াল টপকে পাশের বাড়ীতে যাবার একটা পথ আছে। বিপ্লবীরা বুঝলেন, মণীন্দ্র রায় এই পথ দিয়েই পালিয়ে গেছেন। এবার নলিনীবাবু আদেশ দিলেন—'পালাও'। ঐ পথেই সকলে বাইরে এলেন। আহত পা নিয়ে প্রভাসবাবু বেশী দূর যেতে পারলেন না। সকাল ১০টার সময়ে কামাখ্যা পাহাড়ে তিনি ধরা পড়লেন। সেই দিনই শ্মশানে এক মড়ার বিছানার মধ্যে পুলিশ মণীন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করে।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার আগে গৌহাটির নবগ্রহ পাহাড়ের পূর্বদিকে পুরাতন শিলং রোডের ধারে বিপ্লবীরা মিলিত হলেন কর্তব্য স্থির করার জন্য। পুলিশ এসে তাঁদের ঘিরে ফেলল। বিপ্লবীরা যথাসাধ্য বাধা দিলেন। কিন্তু এই অসম সমরে তাঁরা পেরে উঠলেন না। প্রথমে তারাপ্রসন্ন বল আহত হয়ে ধরা পড়লেন। এর পরে গ্রেপ্তার হলেন নরেন ব্যানার্জী। নলিনী ঘোষের গুলীতে চণ্ডী ও দণ্ডী নামে ২ জন পুলিশ আহত হল। কিন্তু অন্য ২ জন পুলিশ এসে হঠাৎ তাঁকে পেছন দিক থেকে জাপটে ধরল। তিনি গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার আগেই তিনি নলিনী বাগচী এবং প্রবোধ দাসগুপ্তকে আদেশ দিলেন—"তোমরা গুলী বন্ধ কর, সরে পড়। কেউ তোমাদের দিকে নজর দিচ্ছে না। বিপ্লবীদ্বয় ইতস্ততঃ করছিলেন। তখন নলিনী ঘোষ দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমি দলনেতা। দলনেতা রূপে আমি তোমাদের আদেশ করছি।

আর কালবিলম্ব না করে তোমরা সরে পড়। পুলিশ অন্যমনস্ক আছে, তোমরা হয় তো চলে যেতে পারবে।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুইজন স্থান ত্যাগ করলেন।

এর পরে গৌহাটির শূন্য আশ্রয়গুলি সবই পুলিশের নজরে এল। বিচারে নলিনী ঘোষ ৭ বৎসর, প্রভাস লাহিড়ী ৩ বৎসর এবং নরেন ব্যানার্জি ও তারাপ্রসন্ন বল ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

নলিনী বাগচী এবং প্রবোধ দাসগুপ্ত মুসলমানের ছদ্মবেশে হাঁটা পথে চলতে লাগলেন। অনাহারে এবং পথশ্রমে ক্লান্ত তাঁরা ১৬ দিন পরে লামডিং ষ্টেশনে পৌঁছলেন। রেলের টিকেট কিনে তাঁরা নৈহাটী এবং হুগলী হয়ে বিহারে চলে এলেন। তাঁদের অর্থাভাব দেখে আচার্য কৃপালনী কিছু অর্থ সাহায্য করলেন। কিন্তু বিহারে বসে থাকলে যে তাঁদের চলবে না। কলকাতায় এসে অন্যান্য ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রবোধ দাসগুপ্ত কলকাতায় এসেই ধরা পড়ে গেলেন। নলিনী বাগচীও কিছুদিন পরে কলকাতায় চলে এলেন। কিন্তু ট্রেনের মধ্যে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রথমে নিদারুণ জ্বর ও পরে বসন্ত দেখা দিল। কলকাতার কোন আশ্রয় তাঁর জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত বসন্ত রোগে অর্ধচেতন অবস্থায় গড়ের মাঠে গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে সতীশ পাকড়াশী অন্য পথে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। নলিনী বাগচী তাঁর ঠিকানা জানতেন না। কিন্তু কোন বাসায় আছেন তা বিহারে বসেই জানতেন। তিনি এক পথিককে দিয়ে সেখানে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সংবাদ পেয়ে সতীশবাবু এসে নলিনীকে বাসায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু ফেরারী বিপ্লবীকে হাসপাতালে অথবা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করা চলে না। সতীশবাবু নিজেই বসন্তরোগীর চিকিৎসার ভার নিলেন। দিনে রাত্রিতে বিশ্রাম নেই। তিনি রোগীর সেবায় রত। নলিনী ক্রমেই চেতনা হারালেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ৭।৮ দিনের মধ্যেই রোগ নিরাময়ের লক্ষণ দেখা গেল। ক্রমে নলিনী সেরে উঠলেন। এই সময়ে ফেরারী বিপ্লবী তারিণী মজুমদার এসে নলিনীকে নিয়ে ঢাকা চলে গেলেন। ঢাকার ২৮নং কলতাবাজার ষ্ট্রীটে হরিচৈতন্য দের নামে এক বাসা ভাড়া করা হয়েছিল। তারিণী এবং নলিনী সেখানে এসে উঠলেন। কিন্তু কেমন করে জানি পুলিশ সংবাদ পেল। সেদিন ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন। শেষরাত্রি ৪টার সময় পুলিশ এসে ঐ বাড়ীতে হানা দিল। পুলিশ দলে ছিলেন ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট এবং গোয়েন্দা ইনসপেক্টর বসন্ত মুখার্জী, দুইজন দারোগা, হেডকনষ্টেবল পাতিরাম সিং এবং অসংখ্য পুলিশ। তারিণী শেষ রাত্রে উঠে নিয়মিত ব্যায়াম করছিলেন। নলিনীও ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত

হচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল এক ব্যক্তি দেওয়াল টপকে ভিতরে এসে দরজা খুলে দিল। এর পরেই পুলিশ সদলবলে ভিতরে ঢুকল। তারিণী সমস্ত বুঝে মশার পিস্তলটি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। এই সময়ে ইন্‌সপেক্টর প্রফুল্ল বিশ্বাস এগিয়ে এলেন। তারিণীর প্রথম গুলী তাঁর কপাল বিদ্ধ করল। তাঁর আঘাত গুরুতর ছিল না। তবুও তিনি মৃতের ন্যায় ভান করে পড়ে রইলেন। যতক্ষণ সংগ্রাম চলেছিল তিনি আর উঠবার চেষ্টা করেন নাই। তারিণীর কাছে যতক্ষণ গুলী ছিল তিনি গুলী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় গুলীতে গোয়েন্দা ইন্‌স-পেক্টর বসন্ত মুখার্জী গুরুতর আহত হলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁর বাঁচার আশা ছিল না। কিন্তু পুলিশদল সংখ্যায় বহু ছিল। বাধা পেয়েও তারা অগ্রসর হতে লাগল। তারিণীর মশার পিস্তলের গুলীর প্রত্যুত্তরে তারা রাইফেল থেকে অনবরত গুলী চালিয়ে যাচ্ছিল। নলিনী বাগচীও তারিণীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রথম গুলী ছিল পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেন্টকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে গুলী অল্পের জন্য ব্যর্থ হল। দুই পক্ষেই গুলী চলতে লাগল। পুলিশ দলে তিনজন নিহত হল। এর মধ্যে একজন পাতিরাম সিং। যতক্ষণ জীবন ছিল তারিণী গুলী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই অসম যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সহসা একটা রাইফেলের গুলী এসে তাঁর বুকে বিদ্ধ হল। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মৃতদেহ যখন পুলিশের হস্তগত হল দেখা গেল দেহের বহু স্থানই গুলীবিদ্ধ। নলিনীর পক্ষেও সে গুলীবৃষ্টির মধ্যে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হল না। তিনিও গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ উঠে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক হাতে দেয়াল ধরে অন্য হাতে গুলী চালাতে লাগলেন। কিন্তু নলিনীর পক্ষে এ যুদ্ধ বেশীক্ষণ চালানো সম্ভব হল না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর মুমূর্ষু দেহ পুলিশের হস্তগত হল। হাসপাতালে নলিনীর মৃত্যু হল। পুলিশ তাঁর পরিচয় জানবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও আপনার পরিচয় জানাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বিপ্লবীর নাই। বিপ্লবী unhonoured, unwept and unsung চলে যাবেন। এজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। মৃত্যুর আগে বার বার জিজ্ঞাসিত হয়েও নলিনীর একমাত্র উত্তর—'Don't dis-turb me. Let me die peacefully'. বিপ্লবীর চক্ষুদ্বয় কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরতরে নিমীলিত হল। নলিনী বাগচী বীর শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন।

কলতাবাজারের ঘটনা যেদিন হয় তার দিন পনের আগেকার কথা। ১৯১৮ সালের ২৭শে মে গৌহাটি থেকে চলে এসে বিপ্লবী নিকুঞ্জ পাল আশ্রয় নিয়েছেন

সিরাজগঞ্জে এক গোপন গৃহে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বিপ্লবী গোবিন্দ কর। পুলিশ চরের মুখে তাঁদের সংবাদ পেল। গভীর রাত্রিতে গৃহে হানা দিল পুলিশের বড় সাহেব, একজন ইনসপেক্টর, দুজন দারোগা, একজন হাবিলদার, এবং ছয়জন কনষ্টেবল। স্থানটি নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে ঘাটঘরিয়া থানার তেনজিনা গ্রামে। বিপ্লবীরা পুলিশ-বেষ্টিত বুঝতে পেরেই শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। একটা টিলার মত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দুজনে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলী করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ সঙ্গী নিকুঞ্জকে বললেন "আমি গুলী চালাচ্ছি। তুমি পাশের পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যাও।" নিকুঞ্জ গুলী চালাতে চালাতে পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেলেন। গোবিন্দও কিছুক্ষণ পরে নিজের রিভালভরটি ফেলে দিয়ে বললেন, 'এবার তোমরা আমাকে ধরতে পার'। গোবিন্দ সংগ্রামে গুলীবিদ্ধ হয়েছিল। পরে ১৯২৬ সালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি সারা জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়েও তাঁর দেহে বুলেটের দাগ ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকুঞ্জ পাল ১৯১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর আগে একবার ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু জেল থেকে পালিয়ে এসে আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেন। গোপটিতে তিনি ফেরারী বিপ্লবী রূপে বাস করছিলেন।

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটানা বার বছর ধরে সরকারের সঙ্গে বিপ্লবীদের যে সংগ্রাম চলছিল কলতাবাজার সংগ্রাম তারই শেষ অধ্যায়। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গ লাট ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গ লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার প্রচেষ্টায় এ অধ্যায় আরম্ভ এবং ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন কলতাবাজারে এ অধ্যায় শেষ। বিপ্লবী সংগ্রামের এপর্ব প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, সত্যেন বসু, কানাই লাল, যতীন মুখার্জী, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, তারিণী মজুমদার এবং নলিনী বাগচা প্রভৃতির আত্মদানে সমুজ্জ্বল। বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে।

অষ্টম অধ্যায়
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে

১৯১৭ সালে বুঝা গেল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। তাই ব্রিটিশ বাঁ হাতে ডান হাতে উপহার দেবার জন্য উদ্যোগী। ডান হাতে এল মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আর বাঁ হাতে এল কঠোর নিষ্পেষণী রাউলাট আইন। এর আগে ভারত রক্ষা আইন ছিল সাময়িক, আইনের মেয়াদ ছিল যুদ্ধের সময় পর্যন্ত। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ১৯১৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সরকারী আদেশে লণ্ডন হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ রাউলাটকে প্রেসিডেণ্ট করে বোম্বাই হাই-কোর্টের বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শাস্ত্রী এবং উত্তর প্রদেশের স্যার ভার্নি লোভেট ও কলকাতার প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে সদস্য করে কমিটি গঠিত হল বিপ্লবান্দোলন দমন করার কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ১৯১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল কমিটি রিপোর্ট পেশ করল। এই রিপোর্টই সিডিশন কমিটি রিপোর্ট বা রাউলাট কমিটি রিপোর্ট নামে খ্যাত। কমিটি বিপ্লব আন্দোলন দমন করবার জন্য এক আইনের খসড়াও পেশ করলেন। আইনের কঠোরতা দেখে সমগ্র দেশে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। কিন্তু সরকার অনমনীয়। প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ সেদিনের সরকারী বিধান পরিষদে এ বিল গৃহীত হল। আইনের কঠোরতা মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি বড়লাটের নিকট আবেদন করেছিলেন যে এ আইন যেন বিধিবদ্ধ না হয়। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এ আইন বিধান-সভায় গৃহীত হলে তিনি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবেন। তদনুযায়ী ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ পালিত হবে স্থির হল। হরতালের দিনে কয়েক স্থানে জনতার বিক্ষোভ আইনের সীমা লঙ্ঘন করে। দিল্লী প্রভৃতি কয়েক স্থানে পুলিশের গুলীতেও কয়েকজন হতাহত হল। ৯ই এপ্রিল পাঞ্জাবে ডঃ সত্য পাল এবং ডঃ কিচলুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ১০ই এপ্রিল প্রতিবাদে অমৃতসরে হরতাল পালিত হল। জনতা দলবদ্ধভাবে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য ২ বার গুলীবর্ষণ করে। ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকটি সরকারী অফিস পুড়িয়ে দেয়। ১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন করা হল। শান্তি রক্ষার ভার জেনারেল ডায়ারের উপর অর্পিত হল। ১২ই এপ্রিল সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হল। কিন্তু আদেশ অমান্য করে ১৩ই এপ্রিল প্রায় দশ হাজার লোকের

এক জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় সমবেত হল। জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র থাকা সত্ত্বেও জেনারেল ডায়ার কামান-বন্দুক নিয়ে এসে তাদের উপর গুলীবর্ষণ করেন। সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৩৭৯, আহত প্রায় দেড় হাজার। বেসরকারী হিসাবে নিহত প্রায় এক হাজার। এর পরে সামরিক আইন জারী হল। জনতার উপর কয়েকদিন ধরে বর্ণনাতীত অত্যাচার চলতে লাগল।

১৯২০ সালের ১৪ই মে সেভার্স সন্ধির শর্তসমূহ প্রকাশিত হল। তুর্কীর সুলতানকে কনস্তান্তিনোপলে মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী করে রাখা হল। তুর্কী সাম্রাজ্যকে আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত করা হল। যুদ্ধের সময়ের আশ্বাসবাণী অমান্য করে এরূপ হীন শর্ত আরোপ করাতে ভারতীয় মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এলাহাবাদে নিখিল ভারত মোসলেম লীগের সম্মেলনে তিনি অসহযোগ প্রস্তাব আনলেন। ২৭শে মে বোম্বাই-এ খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হল। এদিকে পাঞ্জাবে অত্যাচার সম্পর্কে কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল ২৫শে মার্চ। কিন্তু গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "গান্ধীজী এই আন্দোলনকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলিলেন এবং ১৯২০ সালের প্রথমে খিলাফত আন্দোলনই তাঁহার কাছে গুরুতর বলিয়া মনে হইল। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক হিন্দুও ইহাতে যোগ দিলেন। গান্ধীজী যুক্তি দেখাইলেন বিপদে সহায়তাই বন্ধুত্বের পরিচায়ক। যদি মুসলমানের বিপদে আমরা সাহায্য না করি তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য অসম্ভব। এই যুক্তি খুব উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু গান্ধীজী জাতীয়তাবাদের মূল সূত্রটিই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কোন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যে একটি জাতি করিতে হইলে তাহার সর্বপ্রধান উপাদান এই যে, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির সহিত অপরের যে সম্বন্ধ, দেশের বহির্ভূত অন্য কোন গোষ্ঠীর সহিত একটিরও তদনুরূপ বা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে না। যদি থাকে তাহারা এ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় যদি ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা তুরস্কের বা অন্য দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকতর ঘনিষ্ঠ মনে করে তবে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া ভারতে এক জাতি গঠন অসম্ভব।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৮২)

১লা এবং ২রা জুন কেন্দ্রীয় খিলাফত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল। গান্ধীজী পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১লা

আগষ্ট হরতাল ঘোষণা করা হল। এর পরে ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল। মূল প্রস্তাবে বলা হল যে, তুরস্কের প্রতি অবিচার এবং পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের একমাত্র উপায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। ৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হল। পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনেও গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল। চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের নিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

এর আগেই ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ডিসেম্বর মাস থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হতে লাগল। যাঁরা আন্দামানে ছিলেন তাঁরাও ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেলেন।

মুক্তির পরে পুলিনবাবু কিছুদিন ফরিদপুরে স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। কিছুদিন পরে অন্তরীণের নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে তিনি পূর্ববঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা ঘুরে এলেন। সর্বত্র মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা, দীর্ঘ কারাবাসের পরে বিপ্লবীদের মধ্যে এক নিদারুণ অবসাদ। অন্যদিকে গান্ধী আন্দোলনের অপূর্ব উন্মাদনা। এই সঙ্গে এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি জনতাকে যেন বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই অবস্থায় পুলিনবাবু তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রমে বিশেষ সাড়া পেলেন না।

কিন্তু এসত্ত্বেও গান্ধীজী বুঝলেন, বাংলার বিপ্লবী কর্মীরা তাঁর অসহযোগ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এর সাফল্য হতে পারে না। তিনি দেশবন্ধুর নিকট পুলিনবাবুর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দেশবন্ধু পুলিনবাবুকে স্বগৃহে আহ্বান করে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হল। তিনদিন ধরে আলোচনা চলেছিল। গান্ধীজী পুলিনবাবুকে অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করতে বললেন। গান্ধীজী বললেন যে, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন অহিংস অসহযোগ নীতি একমাত্র পথ এবং এই পথেই স্বাধীনতা আসবে। কিন্তু পুলিনবাবু বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতা স্বীকার করলেন না এবং অহিংস অসহযোগ নীতিতে যে স্বাধীনতা আসবেই এই আশ্বাস বাণীতেও আশ্বস্ত হতে পারলেন না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হল। আলোচনার প্রারম্ভে গান্ধীজী বলেছিলেন, পুলিনবাবুকে তিনি স্বমতে আনবেনই। কিন্তু তিনদিনের আলোচনার শেষে তিনি বললেন, প্রথমে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে যুক্তি চলতে পারে না। পুলিনবাবু এ সম্পর্কে বলেন, "গান্ধী পরিষ্কার ভাবেই বুঝিলেন যে তিনি আমাকে তর্কে পরাভূত করিয়া তাঁহার স্বমত গ্রহণ

করাইতে পারিবেন না। আমি যে গান্ধীকে আমার স্বমত গ্রহণ করাইতে পারিব না তাহা আমি ভালো ভাবেই জানিতাম। সে অভিপ্রায়ও আমার ছিল না।"

অন্য একটি কারণেও গান্ধীনীতি পুলিনবাবুর মনঃপূত হয় নাই। তিনি গান্ধীজীর মোসলেম-তোষণ নীতিও সমর্থন করতে পারেন নাই। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরের ঘটনা। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ীতে পুলিনবাবু বসে আছেন। সৌকত আলি প্রমুখ কয়েকজন মুসলমমান নেতাও সেখানে ছিলেন। গান্ধীজী মোপলা বিদ্রোহ সম্পর্কে কথা বলছিলেন। মোপলাগণ জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করছে, এই কথাই হচ্ছিল। প্রসঙ্গক্রমে গান্ধীজী অহিংসার গুণ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। একজন মুসলমান নেতা বলে উঠলেন, "ধর্মের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা কিন্তু অহিংস থাকতে পারব না।" গান্ধীজী বললেন, "সে অধিকার তো আপনাদের আগেই দেওয়া হয়েছে।" তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দাঁড়িয়ে বলল, "তবে ধর্মের জন্য প্রয়োজন হলে আমরাও কি হিংসা নীতি অবলম্বন করতে পারব ?" গান্ধীজী বললেন, "না না তোমরা পারবে না। কারণ তোমাদের ধর্মে হিংসা সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু সৌকত আলি মুসলমান, তাদের ধর্মে হিংসার স্থান আছে।" হিন্দু যুবকটি বলল, "কেন গীতার মধ্যে তো হিংসা আছে।" কিন্তু গান্ধাজী বললেন, "তোমরা গীতার যে অংশের ঐরূপ অর্থ কর-তা ঠিক নয়।" সে দিন ঐ বৈঠক থেকে পুলিনবাবু গান্ধীবিরোধী মনোভাব নিয়েই ফিরলেন। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন, গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতি দেশের পরাধীনতা মোচনের সহায়ক হবে না, উপরন্তু তাঁর মোসলেম-তোষণ নীতি ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হবে। হয়েছেও তাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেন, "গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে এই মুসলমান-তোষণ নীতি ভারতের জাতীয় জীবনে এমনভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিল যে, দ্রুত বেগে বাড়িতে বাড়িতে এই শিকড় ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাসাদকে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিল। ইহারই ফলে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ দেশের বিভাগ ঘটিল। লর্ড কার্জন যাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন গান্ধীজীর অযৌক্তিক মুসলমান তোষণের নীতি তাহা সার্থক করিয়া তুলিল।" এই সময় কারামুক্ত বিপ্লবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়; পুলিনবাবু ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। পুলিনবাবুর ভাষণটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এস. আর. দাস পুলিনবাবুকে ডেকে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, গান্ধী আন্দোলনের ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। পুলিনবাবু সম্মত হন এবং এস. আর. দাসের

সাহায্যে "ভারত সেবক সঙ্ঘ" নাম দিয়ে এক সংগঠন গড়েন এবং "হক কথা" নামে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রস্তাব হয় যে "শঙ্খ" নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। রবীন্দ্রনাথের নিকট কবিতা চেয়ে পাঠানো হলে তিনি পুলিনবাবুকে দেখা করতে বললেন। পুলিনবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি পুলিনবাবুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

পুলিনবাবু দুইদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরেই পুলিনবাবু "শঙ্খ" পত্রিকা এবং ভারত সেবক সঙ্ঘের সাধারণ কর্মপদ্ধতি জানিয়ে কবির নিকট এক পত্র দেন। পত্রান্তরে কবি পুলিনবাবুকে সহানুভূতি জানালেন এবং এই সঙ্গে "শঙ্খ" পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠালেন।

সাধন কি তোর আসবে নেমে হট্টগোলের কাঁধে ?
খাঁটি জিনিস হয়রে মাটি নেশার প্রমাদে।
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে চোর মেলে না
গোলমালে ফল কি ফলে যোড়াতালির ছাঁদে ?
কে বল তো বিধাতারে ভাড়া দিয়ে ভোলায় ?
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে যাদুকরের ঝোলায় ?
মস্ত বড় লোভের শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের ফাঁদে।

কবিতাটি "শঙ্খ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার এই সংখ্যার জন্য বিপিনচন্দ্র পালও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশ করে নলিনীকিশোর গুহ এর তীব্র সমালোচনা করেন। পুলিনবাবু এতে আপত্তি জানান। ফলে তাঁর সঙ্গে অনুশীলন সমিতির অন্যান্য সহকর্মীদের মতবিরোধ দেখা দেয়। তাঁরা গান্ধীবিরোধিতা মেনে নিতে চান না। পুলিনবাবু স্নেহভাজন কর্মীদের সঙ্গে দলাদলি না করে তাঁদের হাতে কর্মভার ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান। অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বভার এর পরে নরেন্দ্র সেনের উপর পড়ে। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরেই দল ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এর পরে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, বেদারেশ্বর সেন, রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রনাথ সেন সমবেতভাবে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

অনুশীলনের নব নেতৃত্ব সমিতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যতদূর সম্ভব কংগ্রেস এবং গান্ধী নীতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে লাগলেন। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় কংগ্রেস-নেতৃত্ব অনুশীলনের হাতেই এসে গেল।

অন্যান্য জেলায়ও অনুশীলন সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে লাগল। অনুশীলনের এই সময়কার চিন্তাধারা ছিল এইরূপ :— গান্ধী নীতির ব্যর্থতা এক সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়বেই। ভারতবাসীর কোন আত্মত্যাগেই মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে না। ইতিমধ্যে গান্ধী আন্দোলনের সহযোগে ভারতে সশস্ত্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে বিপ্লবীদের হাতে। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম যখন আরম্ভ হবে তখন জনতা আর অহিংস থাকবে না। বিপ্লবী নেতৃত্ব যদি তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারে তবে জনতা সে অস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেই। অনুশীলন সমিতির নেতাদের এই ধারণা যে ঠিক তা ৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় দেখা গিয়েছে।

গান্ধী আন্দোলন এইভাবে এগিয়ে চললো। ১৯২১ সাল অতীত হয়ে ১৯২২ সাল আরম্ভ হল। কারাগারে তখন প্রায় ৪০ সহস্র লোক। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী একদল পুলিশ যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে যায় আন্দোলন দমন করতে। পুলিশ এখানে নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলী চালায়। গুলী ফুরিয়ে গেলে পুলিশ একটি ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জনতা তখন ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ বাইরে আসতে বাধ্য হয়। তখন জনতা তাদের আক্রমণ করে ২২ জনকে হত্যা করে। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

আন্দোলন বন্ধ হতেই যাঁরা কারাকক্ষে ছিলেন ধীরে ধীরে বাইরে এলেন। জনতার উত্তেজনাও অনেকটা কেটে গেল। অনুশীলনের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব এতদিন গান্ধীজীর আবেদন অনুসারে তাঁদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অনেকটা স্থগিত রেখেছিলেন। এই সময় গান্ধী আন্দোলন বন্ধ হওয়াতে তাঁরা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক সংগঠন আরম্ভ করলেন। এবারকার আন্দোলনে তাঁদের কর্মপদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন হল। এবারে ব্যক্তিগত হত্যা পরিত্যক্ত হল। ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহও নিষিদ্ধ হল। এই নূতন কর্মসূচী নিয়ে বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন আরম্ভ হল।

শচীন সান্যালের কাশী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে উত্তর প্রদেশে সমিতির কিছু ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবের সঙ্গেও পূর্ব সম্পর্ক কিছুটা ছিল। এজন্য সমিতির নেতাগণ উত্তর প্রদেশকে কেন্দ্র করেই বহির্বঙ্গ সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে শচীন্দ্রনাথ আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে গৃহে ফিরেছেন। সমিতি তাঁকে কেন্দ্র করেই উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক কাজকর্ম আরম্ভ করল। এর পূর্ব হতেই বাংলা দেশ থেকে কিছু কিছু বিপ্লবী কর্মী

কাশীতে গিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে কুমিল্লার শশী মজুমদার একজন। অনুশীলনের নেতা কেদারেশ্বর সেন এবং তরণী সোমও কিছুদিন কাশীতে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে উপেন্দ্র ধর এবং প্রবোধেন্দু রায় কাশীতে যান। উপেনবাবুর সঙ্গে বিচিত্রবাবুর পরিচয় হয় এবং ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হয়। বিচিত্রবাবু পরে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। রাসবিহারীর সহকর্মী নগেন্দ্রনাথ দত্ত এর আগে কাশীতে ছিলেন। তিনি কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন। দণ্ডভোগকালে আগ্রা জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে অনুশীলন নেতৃবৃন্দ যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে উত্তর প্রদেশে পাঠান। তাঁকে শচীন্দ্র নাথের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুরাতন সংগঠনকে নূতন রূপে গড়ে তুলতে বলা হয়। যোগেশবাবু যখন কাশী যান তখন সেখানে অনুশীলনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। যোগেশবাবুকে কার্যভার বুঝিয়ে দিয়ে সতীশচন্দ্র বাংলাদেশে ফিরে এলেন। এই সময়ে কিছুদিন স্বামী সত্যানন্দ পুরীও কাশীতে ছিলেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল প্রফুল্ল সেন। সন্ন্যাসী রূপেই তিনি বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কাশী থেকেই তিনি মালয়ে যান এবং রাসবিহারী বসুর সহকর্মী রূপে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন সিঙ্গাপুর থেকে জাপান যাবার সময়ে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সংগঠনে ডাকাতি পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু অর্থ না হলে কোন কাজই চলে না। তাই টাকা জাল করে অর্থাভাব মেটাবার চেষ্টা হয়। এজন্য হায়দরাবাদ থেকে সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আনানো হল। তিনি রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ। শ্রীমানী মার্কেটের উপরে তাঁর সঙ্গে অনুশীলন নেতৃবৃন্দের আলোচনা হয়। গৌহাটি সংগ্রামখ্যাত প্রবোধ দাসগুপ্ত এবং কাশী কল্যাণ আশ্রমের ব্রহ্মচারী শচীন চক্রবর্তীকে নিয়ে টাকা জাল আরম্ভ হল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ২ জনেই ধরা পড়ে পাচ বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যোগেশবাবু কাশীতে গিয়ে আরেকজন কর্মী পেয়েছিলেন শচীন বক্সীকে। অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মনোমোহন গুপ্ত, মন্মথ গুপ্ত এবং প্রণবেশ চ্যাটার্জী। শ্রী চ্যাটার্জী পরে দলের বিশিষ্ট কর্মী চন্দ্রশেখর আজাদকে দলভুক্ত করেন। এ ছাড়া এসময়ে কাশী সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সুদর্শন গাঙ্গুলী এবং জিতেন ভট্টাচার্য। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা মৈত্র।

আন্দামান থেকে ফিরে এসে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে সংযোগ রাখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি এই সময়ে এলাহাবাদে ছিলেন। যোগেশ

বাবু এখানে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শচীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বাংলা-দেশের একজন নেতার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফলে কাশীতে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে রমেশ চৌধুরীর কথাবার্তা হয়। কিন্তু আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এই সময় যোগেশচন্দ্র এবং শচীন্দ্রনাথের মধ্যে এক পরামর্শে স্থির হয় যে, বড়লাট লর্ড রিডিং-কে হত্যা করা হবে। শচীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসে দেশবন্ধুর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে যান। ছেদ্দালাল নামক জনৈক কর্মীকে সিমলাতে বড়লাটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু ছেদ্দালাল দৃঢ়চেতা কর্মী না হওয়ায় পরিকল্পনা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

কাশী সংগঠন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যোগেশচন্দ্র অন্যান্য জেলার প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ে সে পর্যন্ত কোন বিপ্লবী সংগঠন ছিল না। যোগেশচন্দ্র প্রতুল গাঙ্গুলীর পত্র নিয়ে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং কিছু অর্থ সাহায্যেরও ভার নিলেন। যোগেশচন্দ্র শচীন বক্সীকে লক্ষ্ণৌয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মী করে বসালেন।

এই সময় কলকাতায় প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের আলোচনা হয়। দলের বহির্বঙ্গ সংগঠনের কর্মসূচীতে তিনি কিছুটা পরিবর্তন চাইলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে বৈপ্লবিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক আন্দোলন দৃঢ়ভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু বাহির্বঙ্গে তা হয় নাই। শচীন্দ্রনাথ বহির্বঙ্গ সংগঠনের জন্য সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং ডাকাতি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা চাইলেন। প্রতুলবাবু এতে সম্মত হলেন না। এর পরে শচীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করেন। মহারাজ কিছু উদার মত গ্রহণ করলেন। তিনি শচীন্দ্রনাথের কথার যৌক্তিকতা বুঝলেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হল বহির্বঙ্গ সংগঠন অন্য নামে চলবে এবং অবাঞ্ছিত সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করতে পারবে। ডাকাতি ব্যাপারেও সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করতে পারবে। ফলে, শচীন্দ্রনাথ মূল অনুশীলনের সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করতে লাগলেন। যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব সংগঠনে এই নূতন কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হল। মহারাজ তাঁদের কয়েকটি রিভলভার দিলেন এবং আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বহির্বঙ্গ সংগঠনে বোমা তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য যতীন্দ্রনাথ দাসকে তিনি শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী পরে কাকোরী ডাকাতি এবং স্যাণ্ডার্স হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে লাজপত রায়ের মৃত্যুর

জন্য জনতা বিক্ষুব্ধ ছিল। ফলে, এই সময় স্যাণ্ডার্স হত্যা বিপ্লবীদের জনসমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছিল। কার্যতঃ বাংলার অনুশীলন সংগঠন এবং বহির্বঙ্গ সংগঠন এক সংগঠন রূপেই চলছিল। এই সময় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সর্বত্র জনপ্রিয় হওয়ায় দলের নাম পরিবর্তন করার একটা প্রস্তাব হয়। কিন্তু অনুশীলন বাংলাদেশে জনপ্রিয় বলে ঐরূপ কোন পরিবর্তন করা হয় নি। তাছাড়া বহির্বঙ্গ সংগঠনকে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার ফলে বাংলা সংগঠনেও যেন আঘাত না লাগে এজন্য আলাদা নামে চলাই স্থির হয়। স্থির হয় যে, বাংলাদেশের সংগঠন অনুশীলন সমিতি নামে এবং বহির্বঙ্গ সংগঠন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন নামে চলবে। ত্রিপুরা জেলার ভোলাচং-এ প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রমোহন সেন, মহারাজ এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের মধ্যে এক আলোচনায় এটা স্থির হয়। মহারাজ শচীন্দ্রনাথের হাতে এক পত্র দিয়ে যোগেশচন্দ্রকে সব কথা জানিয়ে দেন। এই সময় আরো স্থির হয় যে, শচীন্দ্রনাথ কাশীতে থেকে কাজ করবেন এবং যোগেশচন্দ্র কানপুরে থেকে তাঁর সঙ্গে এবং সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন। কানপুর যাত্রার আগে যোগেশচন্দ্র কাশীর শহর সংগঠনের ভার রাজেন লাহিড়ীর উপর অর্পণ করে যান। কানপুরে যোগেশচন্দ্রের নাম হল পি. সি. রায়।

কানপুরে বিজয়কুমার সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত এবং অজয়কুমার ঘোষ যোগেশবাবুর সংস্পর্শে আসেন। অজয়কুমার পরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সংগঠন সম্প্রসারিত হয়। বুন্দেলখণ্ড জেলার হামিরপুরে সংগঠন গড়ে ওঠে। হামিরপুর গ্রামের পণ্ডিত পরমানন্দ ছিলেন রাসবিহারীর সহকর্মী। আন্দামানে তিনি মহারাজের সঙ্গে ছিলেন। যোগেশচন্দ্র মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সংস্পর্শে আসেন এবং এইভাবে রামপ্রসাদ বিসমিল, আশফাকউল্লা প্রভৃতি দলভুক্ত হন। এই সময় ভগৎ সিং দলের সংস্পর্শে আসেন। জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার ছিলেন লাহোরে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক। তিনি পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। এই সূত্রে সর্দার অজিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সর্দার কিষন সিং-এর পুত্র ভগৎ সিং তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই সময় ভগৎ সিং-এর বিয়ের এক চেষ্টা হয়। কিন্তু ভগৎ সিং বৈপ্লবিক উন্মাদনার স্বাদ সন্ত গ্রহণ করেছেন। পারিবারিক সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কারের শরণাপন্ন হলেন। এই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল লাহোরে উপস্থিত হওয়ায় জয়চন্দ্র তাঁর হাতে ভগৎ সিংকে অর্পণ করলেন।

ভগৎ সিংকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কি না। তিনি এ প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন। শচীন্দ্রনাথ একখানি পত্র দিয়ে ভগৎ সিংকে কানপুরে যোগেশচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ভগৎ সিং-এর নূতন জীবন আরম্ভ হল। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে একটি মেসে তিনি থাকতেন। যোগেশচন্দ্র যুবকের নবীন উদ্যমকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় নূতন ভাবে দীক্ষা দিতে লাগলেন।

এই ভাবে যোগেশচন্দ্রের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই রায়বেরিলি, ফরাক্কাবাদ, ইটোয়া, শাহজাহানপুর, পিলভিট প্রভৃতি জেলায় বৈপ্লবিক সংগঠন সম্প্রসারিত হল। এলাহাবাদ সংগঠনের ভার ছিল শচীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথের উপর। মীরাট জেলার ভার ছিল বিষ্ণুশরণ দুবলিশের উপর। আলিগড়ে নূতন সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য ভগৎ সিংকে সেখানকার ন্যাশনাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক করে পাঠানো হল। শচীন্দ্রনাথ কলকাতা গিয়ে জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে রিভলভার-পিস্তল সংগ্রহ করছিলেন। সংগঠন প্রসারে এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় যোগেশচন্দ্র কুমিল্লা গিয়ে মহেশ ভট্টাচার্যের নিকট থেকে কিছু অর্থ নিয়ে এলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ সামান্য। এই সময় কাশী সংগঠনের কর্মী কেশব চক্রবর্তীকে বাইরে পাঠানো হয়। তিনি মাথায় টুপি দিয়ে জাহাজে মুসলমান খালাসীর ছদ্মবেশে বিদেশে চলে যান। এ কাজে অনুশীলনের বীরেন চ্যাটার্জী এবং দক্ষিণ কলকাতার সুশীল ব্যানার্জী তাঁকে সাহায্য করেন। কেশববাবু নির্দেশমত ইউরোপে কয়েকজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে কানপুরে উত্তর প্রদেশ সংগঠনের কাউনসিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। মূল অনুশীলনের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহারাজ। তিনি কিছুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পাঞ্জাব সংগঠনের কিছু কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় স্থির হল, ভারতে প্রজাতন্ত্র ধরনের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবী সমিতির লক্ষ্য এবং এই ভারত সরকার সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী হবে। অর্থ সম্পর্কে প্রস্তাব করা হল যে, চাঁদার দ্বারা সংগৃহীত অর্থেই সমিতি চলবে। কানপুরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের ৩রা অক্টোবর। এর পরেই ১৮ই অক্টোবর যোগেশচন্দ্র কলকাতায় এলে এখানে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান।

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট বরেন্দ্র ঘোষ এবং অপর তিনটি যুবক শাঁখারীটোলা পোষ্টমাষ্টারকে হত্যা করে পোষ্ট অফিসে ডাকাতির চেষ্টা করেন। বরেন্দ্র বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দলভুক্ত ছিলেন। বরেন্দ্র বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু

পরে সে দণ্ড পরিবর্তিত হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এর পরেই সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি তিন চার জনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি সতের জনকে গ্রেপ্তার করে ১৮১৮ সালের তিন আইনে আটক করা হয়। সন্তোষ মিত্র, সুবোধ লাহিড়ী এবং ধীরেন রায় ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পান। জুরীরা তাঁদের নির্দোষ বলেন। ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী গোপীনাথ সাহা নামে এক যুবক পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ভ্রমে মিষ্টার ডে নামে জনৈক ইংরেজকে গুলী করে হত্যা করেন। ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে বাংলার গভর্ণর লিটন Bengal Criminal Law Amendment Ordinance নামে একটি জরুরী আইন পাশ করেন। এই নূতন আইনে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাংলাদেশের ৭০ জন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গভর্ণর সেদিনের আইন সভায় প্রথমে এই আইন পাশ করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশবন্ধুর চেষ্টায় ৬৬-৫৭ ভোটে তিনি হেরে যান। পরে গভর্ণরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে By Certification তিনি অর্ডিন্যান্স রূপে ইহা পাশ করেন।

যোগেশচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পরে বহির্বঙ্গ বিপ্লবী সমিতিতে বিশেষ অর্থাভাব দেখা দেয়। যোগেশচন্দ্রের পরে রামপ্রসাদ বিসমিল তখন দলের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। অর্থাভাবের জন্য তিনি কাকোরী ষ্টেশনের নিকট রেলের অর্থ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করেন।

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। ৮নং যাত্রী ট্রেন শাহজাহানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিল। কাকোরী ষ্টেশনের নিকট চেন টেনে ট্রেন থামানো হয়। সিন্দুক ভেঙে দিনের সংগৃহীত সমস্ত অর্থ নিয়ে বিপ্লবীরা নিরাপদে লক্ষ্ণৌ পৌঁছলেন। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় দশ জন। ট্রেন থেকে লুণ্ঠিত তিনখানা কারেন্সি নোট শাহজাহানপুরে পাওয়া গেল। ফলে পুলিশ শাহজাহানপুরকেই কেন্দ্র করে তল্লাসি আরম্ভ করল। এখানকার সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের সন্ধান চলতে লাগল। জানা গেল, রামপ্রসাদ বিসমিল ৮ই আগষ্ট থেকে ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত শহরে ছিলেন না। পুলিশ জানল, বিসমিলের পত্র আসে ইন্দুমোহন মিত্রের ঠিকানায়। ঐ সব পত্র খোলা হতে লাগল। ২৬শে সেপ্টেম্বর একই দিনে প্রদেশব্যাপী গ্রেপ্তার আরম্ভ হল। প্রায় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এর আগেই বাঁকুড়ায় লাল ইস্তাহার প্রচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁদের পুনবায় গ্রেপ্তার করে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হল। শচীন বক্সী, আসফাকউল্লা এবং চন্দ্রশেখর আজাদ ফেরার হলেন। যোগেশচন্দ্র কলকাতায় যখন গ্রেপ্তার হন তাঁর কাছে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের একটা কপি পাওয়া যায়। এ জন্য তাঁকেও দলনেতা বলে হাজারিবাগ জেল থেকে নিয়ে এসে আসামী করা হয়। মামলা পরিচালনার জন্য এক কমিটি গঠিত হল মতিলাল নেহেরুর চেষ্টায় গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে।

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা আরম্ভ হল। ২১ জনকে সেসনে সোপর্দ করা হল। ১৯২৭ সালে ৬ই এপ্রিল সেসন জজ রায় দিলেন। রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং এবং রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসি, মন্মথনাথ গুপ্ত ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, মুকুন্দীলাল, গোবিন্দচরণ কর, শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবৎ জীবন কারাদণ্ড, রাজকুমার সিংহ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুশরণ দুবলিস এবং রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রীর দশ বৎসরের কারাদণ্ড। প্রেমকৃষণ খান্না, রামদুলারী ত্রিবেদী, রামনাথ পাণ্ডে এবং ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের ৫ বৎসর কারাদণ্ড, প্রণবেশ চ্যাটার্জীর ৪ বৎসর কারাদণ্ড। মূল মামলা চলতে থাকা কালে শচীন্দ্র বক্সী এবং আসফাকউল্লা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের অতিরিক্ত মামলার বিচারে আসফাকউল্লার ফাঁসি এবং শচীন্দ্র বক্সী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর গোরক্ষপুর জেলে রামপ্রসাদের ফাঁসি হয়। শ্বেতাঙ্গ অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার শেষ ইচ্ছা কি?" রামপ্রসাদ নির্ভীক ভাবে উত্তর করেন—"I wish the downfall of British Empire."

ঐ দিন ফৈজাবাদ জেলে আসফাকের ফাঁসি হয়। ফাঁসির কয়েক দিন আগে জেল থেকে তিনি তাঁর প্রাণের কথা গোপন পথে দেশবাসীকে জানিয়ে গিয়েছেন। আসফাকের প্রতিটি কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়কে নিঃসন্দেহে স্পর্শ করবে। "ভারতের রঙ্গভূমিতে আমার অংশ আমি অভিনয় করে গেলাম। আমি ন্যায় করিয়া থাকি বা অন্যায় করিয়া থাকি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যই করিয়াছি। বিপ্লবীর জীবনে যোদ্ধার বীরত্ব এবং বৈদান্তিকের ঔদাসীন্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসী ভাই সব, তোমরা যে ধর্মাবলম্বীই হও না কেন, যে সম্প্রদায়ের লোকই হও না কেন সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ কর। বৃথা কেন এই সাম্প্রদায়িক কলহ? বৃথা কেন এই রক্তপাত? সব ধর্মই কি এক নয়? হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা কি বিভিন্ন?

আমাদের মৃত্যু তোমাদের বুকে যদি একটুও বাজে তাহা হইলে আপনাদের সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া আমলাতন্ত্রের কাছে ইহার প্রকৃত প্রতিবিধান কি দাবী করিবে না? নিজের মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকু দুঃখ নাই। বরং এই ভাবিয়া গর্বে আমার বুক আজ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে যে সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে দেশের জন্য প্রাণ দান করিবার সৌভাগ্য আমারই হইল প্রথম। মরণের পূর্বে দেশবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, ভারতবাসী সুখী হউক।" ঐ ১৯শে ডিসেম্বরই ঠাকুর রোশন সিং-এরও ফাঁসি হয়। রাজেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয় এর দুইদিন আগে গোণ্ডা জেলে।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন ভারতে আসে। ভারতবাসী কতটা স্বাধীনতার উপযোগী হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। ভারতবাসী এতে অপমানিত বোধ করে। কমিশন যেদিন লাহোরে পদার্পণ করে পাঞ্জাবকেশরী লালা রাজপত রায়ের নেতৃত্বে এক শোভাযাত্রা 'Go Back Simon' ধ্বনি করে লাহোর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। এস-পি মিষ্টার স্কট এবং তাঁর সহকারী মিষ্টার স্যাণ্ডার্স লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করেন। লাঠির আঘাতে লালাজী আহত হন। তিনি শয্যাশায়ী হন। এই আঘাতের ফলে আগষ্ট মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। এইজন্য অবাঞ্ছিত সরকারী কর্মচারী বলে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে মিষ্টার স্কটকে হত্যার সিদ্ধান্ত করা হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ তখন ফেরারী। নূতনভাবে দল গঠন এবং স্কট হত্যার নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহকারী ছিলেন ভগৎ সিং। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্কটকে না পেয়ে তাঁর সহকারী স্যাণ্ডার্সকে পেয়ে তাঁকেই হত্যা করা হল। স্যাণ্ডার্স হত্যা হয় ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। ভগৎ সিং, শিবরাম, রাজগুরু এবং সুখদেব এই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন। বোমা তৈরী করার জন্য লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ একটি কারখানা স্থাপন করা হয়। শাহরাণপুরে এবং আগ্রায়ও দুটি বোমা তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হয়। কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ বোমা বিস্ফোরণে বিপ্লবী ভগবতীচরণের মৃত্যু হয়। স্যাণ্ডার্স হত্যার চার মাস পরে দিল্লী এ্যাসেমব্লীতে যখন Public Safety Bill-এর আলোচনা চলছিল দুইটি স্থান থেকে দর্শক গ্যালারীর মধ্য থেকে দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমা নিক্ষেপ করেন ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে দুইজনেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। যে ট্রেনে সাইমন কমিশন লাহোরে গিয়েছিল ডিনামাইট দিয়ে সেই ট্রেন উড়িয়ে দেবার এক পরিকল্পনাও বিপ্লবীদের ছিল। কাকোরী মামলায় দণ্ডিত যোগেশ চ্যাটার্জীকে উদ্ধার করার এক পরিকল্পনাও করা হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ১৬ই মে কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ তল্লাসী হয় এবং এখানে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যায়। শাহরাণপুরের বোমার কারখানাও পুলিশের নজরে আসে। এখানে শিব বর্মা এবং জয়দেব কাপুর গ্রেপ্তার হন। এরপরে ১৯৩০ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং গোপনে কলকাতা এসেছিলেন। তিনি মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছ থেকে দুটি রিভলভার নিয়ে যান এবং বোমা তৈরী শেখাবার জন্য একজন কর্মী চাইলে যতীন দাসকে দেওয়া হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন দাসও গ্রেপ্তার হন। মামলায় আসামী ছিলেন মোট বত্রিশ জন। লাহোরে যতীন দাস অন্যান্য বিপ্লবীদের বোমার উপাদান গান কটন তৈরী শিক্ষা দিতেন।

পাঞ্জাবী বিপ্লবী রামশরণ সিং ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। মুক্তি পেয়ে তিনি কলকাতা আসেন। ১৬৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে অনুশীলন কেন্দ্রে তিনি থাকতেন। পাঞ্জাব সংগঠনের সঙ্গে বাংলা সংগঠনের সংযোগ রক্ষার তিনি ব্যবস্থা করতেন। ১৯২৯ সালে তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই সময় তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের বাঁচাবার জন্য পুলিশের নিকট এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি থেকে বাংলা এবং পাঞ্জাব সংগঠনের অবস্থা বোঝা যাবে: "১৯২৮ সালে ১৬৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে কেদারেশ্বর সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং রবীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমি বোমা পিস্তল লইয়া পুনরায় সন্ত্রাসমূলক কাজ করার প্রস্তাব করি। কিন্তু ঐ সকল নেতা বলেন যে, অনুশীলন বর্তমানে হিংসামূলক কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্তমানে তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে এবং শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে কাজ করিতেছেন। তবে পাঞ্জাবে অথবা বাংলার বাহিরে আমরা অনুশীলনের পুরাতন বন্ধু বিপ্লবীরা যদি কিছু করিতে চাই ভগৎ সিং, যতীন দাস প্রভৃতিকে লইয়া আমাদের নিজ দায়িত্বে তাহা করিতে পারি। এর পরে ভগৎ সিংকে আমিই দিল্লী পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করিতে পাঠাই। এর জন্য আমিই দায়ী।"

১৯২৯ সালের ২৮শে অক্টোবর কৈলাসপতি দিল্লীতে গেপ্তার হয়। ঐ সময় চারটি বোমার খোল, একটি পিস্তল, বোমা তৈরির মালমসলা এবং অনেক রাজদ্রোহজনক পুস্তিকা তার কাছে পাওয়া যায়। সে পুলিশের অত্যাচারে রাজসাক্ষী হয় এবং নিম্নোক্ত বিবৃতি দেয়। "বাংলার দলের সঙ্গে পূর্বে যে সংযোগ ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর ছিন্ন সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হীরেন্দ্র

মজুমদারকে দিল্লীতে পাঠানো হয়। এই হীরেন্দ্রই কৈলাসপতি প্রভৃতিকে প্রতুল গাঙ্গুলীর সহিত আলাপ করিয়ে দেন।"

প্রথম থেকেই বিপ্লবী বন্দীদের প্রতি লাহোর জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ ভাল ছিল না। এর প্রতিবাদে তাঁরা অনশন আরম্ভ করেন। অনশনে যতীন্দ্রনাথের দাবী ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি স্বতন্ত্র আচরণ। রাজনৈতিক বন্দীরা অপরাধপ্রবণ নয়। একটা আদর্শের জন্য জেল খাটছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতি আচরণ অন্য কয়েদীদের মত হতে পারে না। মৃত্যুর সংকল্প নিয়েই যতীন্দ্রনাথ অনশন আরম্ভ করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত হল। তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যতীন্দ্রনাথের অনশনে সমগ্র ভারতে অপূর্ব সাড়া পড়ল। নানা স্থানে সভা-সমিতি করে তাঁর দাবী সমর্থন করা হতে লাগল। হাজরা পার্ক থেকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে শোভাযাত্রীরা প্রচারপত্র দিল—

বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাল
পঞ্চনদের তীরে।

কিন্তু সরকার অনমনীয়। ৬৩ দিন অনশন করে ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ আত্মদান করলেন। মৃতদেহ কলকাতায় আনা হল। পথিমধ্যে প্রতি ষ্টেশনে জনসমাবেশ, অপূর্ব উন্মাদনা, সর্বত্র জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি এবং পুষ্পবর্ষণ। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের প্রবেশপথে লেখা ছিল—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ৭ জন রাজসাক্ষী হল। বাংলার বাইরে বিপ্লবীদের দলভুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা হয় নাই। রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ তার সাক্ষ্যে বলে যে, সে ১৯১৬ সালে অনুশীলন দলভুক্ত হয়। এতগুলি রাজসাক্ষী বিপ্লবী চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় নয়। তবুও যতীন্দ্র নাথের আত্মদান লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাকে এক অপূর্ব শ্রদ্ধার রূপ দান করল। ২৩শে মার্চ লাহোর জেলে ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের ফাঁসি হল। এর আগে বিচারে বিজয় সিং, শিববর্মা, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, ডাঃ জয়দেব কাপুর এবং কমল তেওয়ারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হল। ২৪শে মার্চ কংগ্রেস অধিবেশনে ভগৎ সিং প্রভৃতির সাহস ও ত্যাগের আদর্শ সম্পর্কে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লবীরা বেতিয়ার মীনাবাজারে রাজসাক্ষী ফণী

ঘোষকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করেন। ফণী গুরুতর আহত হয় এবং পরে মারা যায়। এই অপরাধে বৈকুণ্ঠ শুকুল ও চন্দ্রমা সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। চন্দ্রমা সিং খালাস পান এবং বৈকুণ্ঠের ফাঁসি হয়।

কাকোরী ডাকাতির পরে দলের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদ ফেরারী জীবন যাপন আরম্ভ করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ আলফ্রেড পার্কের এক বেঞ্চিতে বসে তিনি এক বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ পুলিশ এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল। পুলিশ অফিসার প্রথমে গুলী করেন। আজাদও গুলী আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ ধরে সংগ্রাম চলল। কিন্তু রাইফেলের বিরুদ্ধে একটিমাত্র রিভলভার নিয়ে আজাদের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম সম্ভব হল না। সংগ্রাম করতে করতে আজাদ মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃতদেহ পুলিশের হস্তগত হল। ৬ই জুন কানপুরে একজন ফেরারী বিপ্লবীকে ধরতে গিয়ে দুজন পুলিশ আহত হন। বীর বাহাদুর তেওয়ারী নামে জনৈক বিপ্লবী পুলিশের চর হয়েছে সন্দেহ করে ১৮ই জুলাই তাকে হত্যার চেষ্টা হয়। ২৪শে নভেম্বর তার ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়। ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন কলকাতা থেকে দিল্লী যাচ্ছিল। দিল্লী থেকে ১৪ মাইল দূরে বোমা ফাটল গাড়ীর নীচে। গাড়ীর বেশ ক্ষতি হল। কিন্তু লাট সাহেব অক্ষত দেহে রক্ষা পেলেন। এর চোদ্দ মাস পরে এলাহাবাদ শহরতলীর এক দোতলা ফ্ল্যাটে পুলিশ এক ইংরেজ রমণীকে আবিষ্কার করল। তিনি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। রমণী ভারতীয় ভাবধারার অনুরাগী। রমণীর পূর্বনাম এলিস। তিনি এক পাদ্রীর কন্যা। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার সঙ্গে চীন দেশে ছিলেন। ১৯২৮ সালে জাফর আলি নামে এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু মুসলমান-গৃহে পর্দানশীন হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। দুদিনেই প্রেমের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। শ্রীমতী এলিস বুঝলেন তিনি ভুল করেছেন। তিনি বইয়ের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলেন। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কয়েকখানা বই পড়ে মুগ্ধ হলেন তিনি। স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে কাশীতে এসে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। এর পরে এলাহাবাদে এসে এক বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরি নিলেন। এখানে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে লাগলেন। এই অবস্থায় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল; নাম নিলেন সাবিত্রী দেবী। ক্রমে সাবিত্রী দেবী একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবী হয়ে উঠলেন।

বড়লাটের গাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বিপ্লবী যশপালের প্রতি পুলিশের সন্দেহ হয়। যশপাল তারপর থেকেই ফেরার। সাবিত্রী দেবীর আশ্রয়ে তিনি থাকতেন। ১৯৩১ সালের ২৩শে জানুয়ারী পুলিশ হানা দিল সাবিত্রী দেবীর গৃহে। ঐ গৃহে পাওয়া গেল যশপালকে। যশপাল রিভলভারের গুলী করে বাধা দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন। ফেরারী বিপ্লবীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে সাবিত্রী দেবীকেও গ্রেপ্তার করা হল। দেহতল্লাসী করবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে বলা হলে তিনি উঠলেন না। হাত ধরে জোর করে টেনে তোলা হল। দেখা গেল দুটো রিভলভার এবং ৪০টি কার্তুজের উপর তিনি বসে আছেন। অস্ত্র আইনে এবং সম্রাটের শত্রুকে আশ্রয় দেবার অপরাধে বিচারে তিনি চার বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। এর সাত দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু অনুশীলন নেতৃবৃন্দ সম্ভবতঃ একটু ভুল করেছিলেন। বাংলা এবং বাংলার বাইরের সংগঠন একই সংগঠন। বহির্বঙ্গ সংগঠনকে বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলার জন্য সংগঠন ভিন্ন অন্য কোনও কর্মসূচী নাই। এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। তাই বাংলার বাইরে নূতন ভাবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বাংলাদেশে একদল তরুণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তাঁরাও বহির্বঙ্গের অনুরূপ কাজকর্মের সুযোগ চান। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে আরও একটা কারণ ছিল। এটা ছিল আইরীশ বিদ্রোহের যুগ। আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন বড় রকম সংগ্রাম হয় নাই। বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে নরহত্যা প্রভৃতির দ্বারাই তাঁরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে নতি স্বীকার করিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। তাই তরুণ বিপ্লবীরা নেতাদের ব্যাপক বিপ্লবের আশ্বাসে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। আইরীশ বিদ্রোহের আদর্শে এদেশেও তরুণদল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা নেতাদের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুমতি দিলেন না। তরুণ বিপ্লবীদের এই নূতন প্রচেষ্টায় বিপ্লব আন্দোলনের একটা নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল। তাঁরা সমস্ত দলীয় ভেদাভেদ ভুলে সকলের সঙ্গে সকলে মিলে গেলেন। বাংলার এই তরুণদল বহির্বঙ্গ সংগঠনের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে ১৯২৪ সালের অর্ডিন্যান্সে অধিকাংশ নেতাই কারারুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা তরুণদলের এই মিলন লক্ষ্য করলেন এবং আরও দেখলেন যে বিচ্ছিন্ন ভাবে

একটিমাত্র সংগঠনের কাজের জন্য অন্য সকলকেই আটক থাকতে হচ্ছে। তাই তাঁরাও মিলনের জন্য উৎসুক হলেন। যুগান্তর দলের নেতা ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলে অনুশীলন দলের নেতারা মিলিত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অনুশীলন দলের নরেন সেন, রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং সংযুক্ত যুগান্তর দলের ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভুপতি মজুমদার এবং আরো কয়েকজন। জেলের মধ্যে বিভিন্ন দলের মিলন সাধিত হল। এর পরে ১৯২৭।২৮ সালে সবাই মুক্তি পেয়ে বাইরে আসতে লাগলেন। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের কর্মভার নিয়ে মনোমালিন্য দেখা দিল। ফলে মিলন ভেঙ্গে গেল। প্রবীণ নেতাদের এই মিলনের মধ্যে তরুণদের ডাকা হয়নি, সুতরাং তাঁরা পূর্বে যেমন বিদ্রোহী হয়ে পরস্পর মিলিত ভাবে কাজ করছিলেন সেই ভাবেই কাজ করতে লাগলেন। এবং প্রবীণ নেতাদের মিলন ভেঙ্গে যাওয়াতে তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কেও তরুণদলের আস্থা নষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত অনুশীলনের ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বহরমপুর এবং কলকাতার দল এবং যুগান্তরের বরিশাল ও ফরিদপুরের বিদ্রোহী তরুণদল এবং চট্টগ্রামের মাষ্টারদার দল এই মিলিত প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হল। ঢাকার বি. ভি. দলের সঙ্গেও এঁরা সংযোগ স্থাপন করলেন। কলকাতা কংগ্রেসের সুযোগে বাহির্বঙ্গের বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গেও এঁদের সংযোগ ঘটে। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে রংপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে সূর্য সেন এবং অনুশীলনের নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশী তরুণ বিদ্রোহী বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। আলোচনার ফলে স্থির হল যে, তিনটি জেলার অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা আক্রমণ করবেন। আরো স্থির হল যে, ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ তাঁদের কার্যক্রম নয়, অথচ সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের জন্য কালক্ষেপ করতেও তাঁরা চান না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম দ্বারা দেশকে ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা আশা করেন যে, এই ভাবে চললে শেষ পর্যন্ত নেতারাও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হবেন। বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগলো। কিন্তু ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পুলিশ ২৩নং মেছোবাজার ষ্ট্রীটের গৃহে হানা দিয়ে সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন এবং অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ৩২ জন যুবককে আসামী করে আরম্ভ হল মেছোবাজার ষড়যন্ত্র মামলা। প্রায় সকলেই দণ্ডিত হলেন।

বিদ্রোহীদের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম সংগঠনই পূর্ণ সংগঠন হিসাবে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে তাঁদের প্রস্তুতি অনেকটা গোপন ছিল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এই বিদ্রোহ পর্বকে আংশিক ভাবে সফল করে তোলেন। এর পরে আরম্ভ হল আবার ধরপাকড়। বিপ্লবী নেতারা এবং অন্যান্য অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁদের আটক রাখা হল বক্সা, হিজলী, বহরমপুর এবং দেউলী বন্দীনিবাসে।

বিপ্লবী নেতাদের বিচার করতে তরুণ বিদ্রোহীরাও কিছুটা ভুল করেছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁদের যে আন্তরিকতা ছিল না তা নয়। প্রকৃত পক্ষে এ জন্য কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৯২৩ সালেই। ১৯২৩ সালে দিল্লী কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে অনুশীলন নিখিল ভারত সংগঠনের এক নেতৃসমাবেশ হয়। উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কর্মীরাও এখানে মিলিত হন। এখানেই বিপ্লবী দলের কর্মসূচী স্থির হয়। কিন্তু দিল্লী থেকে ফেরার পথে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। মস্কো থেকে অবনী মুখার্জী এবং নলিনী গুপ্ত এই সময়ে ভারতে আসেন। তাঁরা অনুশীলনের আশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন। নলিনী গুপ্তের সাহায্যে বোমা প্রস্তুত করার এক ব্যবস্থা হয়। তাঁকে সাহায্য করতেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত।

নবম অধ্যায়
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে প্রবীণ এবং তরুণ বিপ্লবীরা দুই দলই কারারুদ্ধ হলেন। তাঁদের চিন্তাধারায়ও কিছুটা পরিবর্তন এল। প্রবীণরা দেখলেন ব্যাপক প্রস্তুতির পরে অভ্যুত্থানের সুযোগ কর্তৃপক্ষ তাঁদের দেবে না। সুতরাং প্রস্তুতির ব্যাপকতা কমিয়ে তরুণদের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য এগিয়ে এলেন তাঁরা। তরুণরাও দেখলেন প্রবীণদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছুই করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে উভয় দলই মিলনের জন্য আগ্রহী হলেন। মোটামুটিভাবে স্থির হল, স্বাধীনতা প্রচেষ্টা আর পুরানো আদর্শে গণ্ডীবদ্ধ থাকবে না। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সমিতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হল। স্থির হল, ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে আঞ্চলিক বিদ্রোহেরও কর্মসূচী থাকবে। এই মিলনের সংবাদ জেল থেকে বাইরেও জানানো হল গোপনে। বিভিন্ন জেল থেকে কর্মীরা পালিয়ে গিয়ে ফেরারী জীবন অবলম্বন করে কাজ করতে লাগলেন। এদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন কুমিল্লা সংগঠনের কর্মী প্রভাত চক্রবর্তী।

কিন্তু ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে অনুশীলন ব্যতীত অন্যান্য দল, বিশেষভাবে ঢাকার বি. ভি. দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের হত্যার নীতি গ্রহণ করেছিল।

১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট যখন লালবাজার পুলিশ অফিসে আসছিলেন তখন তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু মিঃ টেগার্ট বেঁচে যান। ঘটনাস্থলে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়েন এবং তাঁর সঙ্গী অনুজা সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করেন। বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই ঘটনার পরেই পুলিশ নারায়ণ রায়, ভূপাল বসু প্রভৃতি বহু তরুণকে গ্রেপ্তার করে এবং এক মামলা দায়ের করে। বিচারে নারায়ণ রায় এবং ভূপাল বসুর ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্র দত্তের ১২ বৎসর দ্বীপান্তর ও অন্যান্য কয়েকজনের অল্প দণ্ড হয়। ৩০শে আগষ্ট পুলিশের বড়কর্তা মিঃ লোম্যান এবং ঢাকার এস-পি হডসনকে গুলী করে। ১লা সেপ্টেম্বর লোম্যানের মৃত্যু হল। এর পরে ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং-এর-

ভিতরে গিয়ে জেল বিভাগের প্রধান কর্তা মিঃ সিম্পসনকে গুলী করে হত্যা করেন। বিপ্লবীরা আরও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে গুলী করেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন আহত হন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর তৎপরতার সহিত লালবাজারে ফোন করে দেন। সেখান থেকে মিঃ টেগার্ট, মিঃ গর্ডন প্রভৃতি চলে আসেন। কিন্তু তাঁরা আসার আগেই বিপ্লবীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁরা বাদল গুপ্তকে জীবিত পান নাই। বিনয় বসু এবং দীনেশ গুপ্তকে আহত অবস্থায় পান। হাসপাতালে বিনয়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু দীনেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই তাঁর ফাঁসি হয়।

এর পরের ঘটনা হিজলীর শোচনীয় হত্যাকাণ্ড। হিজলী বন্দীনিবাসে প্রায় ছয় শত বিপ্লবী বন্দী ছিলেন। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি ভাল ব্যবহার করত না। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯টার সময় জেলের প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁরা পায়চারি করছিলেন। সেই সময়ে প্রহরীদের সঙ্গে তাদের বচসা হয়। এর পরে প্রহরীরা বেপরোয়া গুলী চালাতে আরম্ভ করে। সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। কলকাতা থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. সি. চ্যাটার্জী, নিশীথ সেন প্রভৃতি হিজলীতে উপস্থিত হলেন। ১৭ই তারিখ দ্বিপ্রহরে হাওড়া ষ্টেশনে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ পৌঁছে। বিরাট শোভাযাত্রা করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁদের দাহ করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের এক জনসভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই যে হিজলীর গুলীচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অপমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক। কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক-নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।" ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের গভর্ণর মিঃ জি. ডি. মনটো-বেন্‌সিকে হরিকিষাণ নামে এক যুবক গুলী করেন। গভর্ণর বেঁচে যান। কিন্তু তিনি সামান্য আহত হন। বিপ্লবীর গুলীর আঘাতে দারোগা চন্নন সিং নিহত হন। পুলিশের একজন ইনেস্‌পেক্টর আহত হন। একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাও আহত হন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী হরিকিষাণের ফাঁসি হয়।

বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার আরণেষ্ট হটসন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুনা শহরের ফার্গুসন কলেজে গমন করেন। এই সময় বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামক ১৯ বৎসরের এক মারাঠী যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করেন। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ২৭শে জুলাই আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ গার্লিক যখন বিচারাসনে বসে বিচার করছিলেন সেই সময় জনৈক যুবক ঘরে ঢুকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করেন। মিঃ গার্লিক নিহত হন। যুবক পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। যুবকের কাছে একখানা কাগেজে লেখা ছিল, "তুমি নিপাত যাও, দীনেশের প্রতি যে অবিচার করেছ তার ফল ভোগ কর।" ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট টাঙ্গাইল কো-অপারেটিভ অফিসে ঢাকার কমিশনার মিঃ ক্যাসেলকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয়। তিনি আহত হয়ে বেঁচে যান। ২৮শে অক্টোবর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণো সাহেবকে গুলী করা হয়। এই ঘটনার পরে পুলিশ ঢাকা শহরে বেপরোয়া অত্যাচার চালায়। ডুর্ণো সাহেবও আহত হয়ে চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে কলেজিয়েট স্কুলে এক শিক্ষাপ্রদর্শনীতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডিকে গুলী করা হয়। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে বিমল দাশগুপ্তকে সন্দেহ করা হয়। ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভায় পরবর্তী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে গুলী করা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য নামে এক বিপ্লবী ধরা পড়েন। কিন্তু তাঁর সঙ্গী প্রভাংশু পাল পালিয়ে যান। বিচারে প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়। এর পরবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জও ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন। টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান ক্লাবের এক ফুটবল খেলা হচ্ছিল। বার্জ সাহেব টাউন ক্লাবে খেলতেন। এই সময়ে কয়েক-জন যুবক হঠাৎ মাঠে প্রবেশ করে রিভালভারের গুলীতে তাঁকে হত্যা করেন। বার্জের দেহরক্ষীর গুলীতে বিপ্লবীদের মধ্যে অনাথ পাঁজা এবং মৃগেন্দ্র দত্ত মারা যান। অন্যান্য বিপ্লবীরা পালিয়ে যান। এর পরেই মেদিনীপুরে বেপরোয়া অত্যাচার চলে। কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ট্রাইব্যুনালের বিচারে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সনাতন রায় প্রমুখ পাঁচজনের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৩২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সেনেট হলে কনভোকেশন উৎসবে শ্রীমতী বীণা দাস বাংলার গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলী করেন। ট্রাইব্যুনালে শ্রীমতী দাসের বিচার হয়। তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন। তাঁকে নয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঠিক এই সময়ই কুমিল্লায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেনসকে শান্তি ঘোষ এবং

সুনীতি চৌধুরী নামক দুইটি ছাত্রী রিভলভারের সাহায্যে নিহত করেন। তাঁদের দুজনেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৩২ সালের ৫ই আগষ্ট 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন্‌কে একজন বিপ্লবী তরুণ গুলী করেন। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং বিপ্লবী তরুণ পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এর পরে ২৮শে সেপ্টেম্বর মিঃ ওয়াটসনকে পুনরায় গুলী করা হয়। ওয়াটসন সাহেব আহত হন। এই মামলায় আসামী সুনীল চ্যাটার্জী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয় এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভিলিয়ার্সকে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত গুলী করেন। এর আগে তাঁর গুলীতে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডি নিহত হন। মিঃ ভিলিয়ার্স অল্পের জন্য রক্ষা পান। বিচারে বিমল দাশগুপ্ত ১২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত চলছিল। এই সমস্ত কারণে অনুশীলনের আঞ্চলিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও সফল হয় নাই। যাঁরা জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এক বৎসরের মধ্যেই তাঁরা ধরা পড়ে যান। ১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আরও ৩৭ জনকে আসামী করে এক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৭ই আগষ্ট পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত এবং ভোলানাথ দাসকে আসামী শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করেছেন। হিজলী ও বক্সার বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে আসামীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ব্রহ্মদেশে ষড়যন্ত্র করেছেন। আসামী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯৩২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্সা বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে যান এবং ২৬শে ডিসেম্বর গোয়েন্দা দারোগা উপেন্দ্র ঘোষ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। ৩৫নং শিব ঠাকুর লেনে বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল। এখানে ১৯৩২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আসামী হেম ভট্টাচার্য, কিশোরীমোহন দাসগুপ্ত, বিমল ঠাকুর, সুরেন্দ্র ধরচৌধুরী এবং জ্যোতিষ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয় যে, প্রভাত চক্রবর্তীই এই আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের দলপতি। ১৯৩২ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি অন্তরীণ থেকে পালিয়ে যান। কাগজপত্র থেকে বুঝা যায় যে পাঞ্জাব, গুজরাট, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের সহিত বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। অবশেষে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা প্রায় শেষ হয়ে এল। ১৯৩৪ সালের ৩১শে আগষ্ট। সেদিন দিনের বেলায়ই ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পাগলা হাওয়া ছুটছে উন্মত্ত বেগে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বিপ্লবীরা স্থির করলেন এই দুর্যোগের মধ্যেই বাইরে পালিয়ে যাবেন। একজনের কাঁধে আর

একজন চড়ে দেয়াল টপকে বাইরে এলেন পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে এবং সীতানাথ দে। জেল পালানোর ইতিহাসে দিনের বেলা এমন দুঃসাহসিক অভিযান এর আগে হয়নি। এঁরা বাইরে আসার পরে আবার আরম্ভ হল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা, আরম্ভ হল বোমা তৈরীর আয়োজন। কুমিল্লার পারুল মুখার্জীকে নিয়ে এসে টিটাগড়ের বিপ্লব কেন্দ্রকে পরিবারের রূপ দেওয়া হল। গোয়েন্দা কর্তা নলিনী মজুমদারকে এখানে ধরে আনার চেষ্টা হল। কিন্তু বিপ্লবীদের আবার আরম্ভ হল বিপর্যয়। হঠাৎ প্রফুল্ল সেন গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তার পরদিন টিটাগড় বাসায় গ্রেপ্তার হলেন পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, শ্যামবিনোদ পাল এবং পারুল মুখার্জী। কয়েকদিন পরে নিরঞ্জন ঘোষাল এবং সীতানাথ দেও গ্রেপ্তার হলেন। যথাসময়ে বিচারকগণ আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিলেন। প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, সীতানাথ দে, ধীরেন ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এবং পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিশোরী দাসগুপ্ত, পরেশ গুহ, মণীন্দ্র চৌধুরীর হল দশ বৎসর কারাদণ্ড। জ্যোতিষ মজুমদার, বিমল ভট্টাচার্যের ছয় বৎসর কারাদণ্ড। হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল, হেম ভট্টাচার্য, প্রভাত মিত্র, সুরেন ধরচৌধুরী, দ্বিজেন তলাপাত্র, অমিয় পাল, যতীন চক্রবর্তীর ৭ বৎসর কারাদণ্ড। তিন থেকে পাচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন অজিত বসু, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা, জ্যোতির্মুকুল ঘোষ, সঞ্জীব মুখার্জী এবং দ্বিজেন রায়। ভূপেন মজুমদার এই মামলায় পলাতক ছিলেন। ফেরারী অবস্থায় ফরিদপুর পালং আশ্রমে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে আরম্ভ হল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত এবং নিরঞ্জন ঘোষালকে এ মামলায়ও আসামী করা হল। আসামী ৩২ জন—প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ, প্রফুল্ল সেন, ধনেশ ভট্টাচার্য, পারুল মুখার্জী, শ্যামবিনোদ পাল প্রভৃতি। বহু কর্মী এবং পার্টিদরদী গ্রেপ্তার হলেন। বিপজ্জনক রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়াল সন্তোষ সেন। সে সব কথাই প্রকাশ করে ফেলল। কিন্তু আসামীদের সনাক্ত করবার সময় তাঁদের সামনে এসে কেঁদে ফেলল। এর পরে বিচারকগণ রায় দিলেন। প্রফুল্ল সেন ১৪ বৎসর, শ্যামবিনোদ চৌধুরী দশ বৎসর, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের ও নিরঞ্জন ঘোষালের সাত বৎসর, ধীরেন মুখার্জী, হরেন্দ্রনাথ মুন্সী, কার্তিক সেনাপতি, জগদীশ চক্রবর্তীর পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড। জীবন ধূপী, বিভূতি ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জী, জগদীশ ঘটকের চার বৎসর কারাদণ্ড এবং সুধাংশুবিমল দত্ত ও পারুল মুখার্জী তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সাত আটজন মুক্তি পেলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল ভারতের

রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭৩টি ভোট পড়েছিল। এটা উপেক্ষার বিষয় নয়। সুভাষচন্দ্র সর্ব-ভারতীয় তরুণদের নেতা বলে গণ্য হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মহাত্মাপন্থীদেরও শত্রু হলেন। ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলার দধীচি যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশনে মৃত্যুবরণ তরুণ ভারতকে তার স্বাধীনতার পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিল। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আইরীশ বীর টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবারবর্গ নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠালেন। "টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবারবর্গ যতীন দাসের মৃত্যু সম্পর্কে গভীর শোক ও গর্ববোধ করছে—স্বাধীনতা আসবেই"। সাগরপারের এ আশ্বাসবাণী ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতব্যাপী এই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যেও গান্ধীজী তখন অবিচলিত ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "তাঁহার কোন বক্তৃতায় বা তৎসম্পাদিত "Young India" পত্রিকায় যতীন দাসের কোন উল্লেখ করেন নাই।" ১৯৩০ সাল থেকে গান্ধীজীর আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। ইতিহাসে এটা লবণ সত্যাগ্রহ বলে খ্যাত। অন্য দিকে লণ্ডনে চলছিল গোলটেবিল বৈঠক ভারতের স্বাধীনতার যোগ্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। কংগ্রেস প্রথম দিকে এই অধিবেশনে যোগদান করে নাই। কিন্তু ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে কংগ্রেস তার আইন অমান্য স্থগিত রাখল এবং গান্ধীজী লণ্ডন বৈঠকে যোগ দিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "এর আগে লাহোর কংগ্রেসে যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা হইয়াছিল—যাহার জন্য সহস্র সহস্র ভারতীয় দুঃখ কষ্ট কারাবরণ ও মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন এইরূপে তাহার সমাধি ঘটিল।" এই চুক্তি সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মনোভাব আমরা দেখি, "আমরা চুক্তিপত্র দেখিলাম। ইহার অন্যান্য শর্তগুলি আমি জানিতাম। কারণ এইগুলি লইয়া পূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে যেসব বিষয়ে দায়িত্ব ও ক্ষমতা ইংরেজের হস্তে থাকিবে তাহার তালিকা পড়িয়া আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কারণ আমি ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি কোন কথা বলিলাম না। সকলেই শুইতে গেল…আমি দেখিলাম আমাদের লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বাধীনতা—তাহাও বিনষ্ট হইল। ইহার জন্যই কি আমার দেশবাসী এত বছর ধরিয়া বীরের মত লড়িয়াছিল? এত যে বড় বড় কথা ও দুঃসাহসিক কাজ তাহার পরিণাম কি এই? এইরূপ ভাবনায় আচ্ছন্ন হইয়া ৪ঠা মার্চ রাত্রিতে পড়িয়া

রহিলাম। মনে হইল, মনপ্রাণ যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। যেন কোন মহামূল্য দ্রব্য হারাইলাম। জীবনে আর তাহা ফিরিয়া পাইব না।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২৩-২৪)

যাহোক শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি অনুযায়ী গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবী নিয়েই বক্তৃতা করলেন। কিন্তু এই পূর্ণ স্বরাজ পূর্ণ স্বাধীনতা কি না উদ্ঘাটিত হল না। গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সকল সদস্য একমত হতে না পারায় এর ভার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হল। ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী ভারতে ফিরলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালে নূতন সংবিধান রচিত হল এবং এই সংবিধান অনুযায়ী প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। ভারতের সর্বত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পিত হল।

এই নূতন পরিবেশে অনেকেই আশা করেছিলেন যে, কঠোর দমননীতিমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করা হবে এবং বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তা কার্যে পরিণত হল না। ফলে আন্দামানবন্দীরা অনশন আরম্ভ করলেন। তাঁদের দাবী—আমাদের ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দেউলী বন্দীশিবিরের বন্দিগণও অনশন আরম্ভ করলেন। এর ফলে নূতন গভর্ণমেণ্ট বন্দীমুক্তির নীতি গ্রহণ করলেন। আন্দামানবন্দীদের ক্রমিক পর্যায়ে ভারতে আনা হতে লাগল এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মধ্যেও দু'হাজার তিনশ চারজনকে ১৯৩৮ সালের ২৫শে আগষ্টের মধ্যেই মুক্তি দেওয়া হল। এই সময় নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রিসভা বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি দিলেন। রয়ে গেল বাংলা ও পাঞ্জাবের দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব মন্ত্রিসভাও জনমতের নিকট নতি স্বীকার করল। পাঞ্জাববন্দীরাও মুক্তি পেলেন। রয়ে গেল শুধু বাংলার বন্দীরা। ১৯৩৯ সালের ৭ই জুলাই আলিপুর জেলের বন্দীরা তাঁদের মুক্তির দাবীতে অনশন আরম্ভ করলেন। দমদম বন্দীরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তাঁরা অনশন স্থগিত রাখলেন। কিন্তু এর পরেই ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদের দ্বারা জেল আবার পূর্ণ হতে লাগল।

এদিকে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি এই

বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিবেন স্থির করলেন। কিন্তু দেখা গেল বিপ্লবাদের কোন সর্ব-ভারতীয় নেতা নেই। সুভাষচন্দ্রকে এই সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল, তিনি সম্মত হলেন। ১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে মহারাজের সঙ্গে একত্র বন্দী ছিলেন। এই সান্নিধ্য ক্রমে গভীর সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্রের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মহারাজ লিখেছেন, "তিনি অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করিতেন, সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি ছিল না তাঁর, যা পান তাই খান। কাহারও অসুখ করিলে তিনি সারারাত জাগিয়া সেবা করিতেন"। একদিন টেনিস খেলতে গিয়ে মহারাজ আছাড় খেয়ে পড়ে যান। হাঁটুর চামড়া উঠে গিয়ে ক্ষত হয়। সুভাষচন্দ্র প্রত্যহ নিজ হাতে নিমপাতাসিদ্ধ জলে মহারাজের ক্ষত স্থান ধুয়ে দিতেন। ১৯৩৯ সালে, সুভাষচন্দ্র তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, স্থির হল, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আসন্ন সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা হবে। কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই লণ্ডনে এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আপোষ চায়। এর বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথমেই আপোষ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হল। গোপনে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিও চলতে লাগল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনুশীলন নেতাদের পরামর্শে স্থির হল, কংগ্রেস যদি কোন আন্দোলন আরম্ভ করে তাকেও শুরু থেকেই সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। সুভাষচন্দ্র তাঁর আপোষ-বিরোধী মনোভাবের জন্য কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন। ফলে, অনুশীলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। আসন্ন রামগড় কংগ্রেসের সময় আপোষ-বিরোধী সম্মেলন হবে, নির্দিষ্ট হল। সুভাষচন্দ্র মহারাজকে নিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে এলেন। বিভিন্ন স্থানে পুরাতন বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করলেন। সীমান্ত প্রদেশের আকবর শা, হামিরপুরের ভাই পরমানন্দ এবং আরও কয়েকজন কর্মী সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় দলভুক্ত হলেন। সৈন্য দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হল আকবর শার মাধ্যমে। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র এবং প্রতুল গাঙ্গুলীর বাইরে যাওয়া সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এ সম্পর্কেও সীমান্তের কর্মীদের সাহায্য চাওয়া হয়। স্থির হল যে, রামগড় কংগ্রেসের পরেই মহারাজ ফেরার হবেন এবং পাঞ্জাবে অবস্থান করে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজনে রত হবেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা হচ্ছে শুনে চৌধুরী যোগগামল রুর সিং, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি পুরাতন বিপ্লবিগণ আনন্দিত হন এবং সাগ্রহে এ প্রচেষ্টায় যোগ দিতে সম্মত হন। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে মহারাজ মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণে যান। এখানে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং

সেবক সঙ্ঘের নেতা শ্রীকেশব হেডগাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর ষাট হাজার স্বেচ্ছাসেবক সহ আসন্ন সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেবেন, বললেন। মহারাজ কাশীতে বীর সাভারকারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গণেশ দামোদরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালও বিপ্লবের সর্বক্ষণের কর্মীরূপে আন্দোলনে যোগ দিতে সম্মত হলেন। এই সময়ে অনুশীলনের দিল্লীর কর্মী সুশীল ভট্টাচার্য মহারাজকে বললেন, কিছু অর্থ ব্যয় করলে দিল্লী ফোর্ট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ কথা মহারাজ সুভাষচন্দ্রকে জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ ১০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হলেন এবং কয়েক দিন পরে আরও ১০ হাজার টাকা দিবেন বললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় নি। শিখনেতা নিরঞ্জন সিং তালিব রবীন্দ্রমোহন সেনকে জানালেন, আলিপুরে অবস্থিত শিখ সৈন্যদল বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে উৎসুক। আলোচনায় দেখা গেল, এই শিখ সৈন্যদল বৃটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। তাদের ইচ্ছা, বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধের সুযোগে তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করবে। সৈন্যগণ জানায়, তারা অস্ত্রাগার দখল করবে, কেল্লা দখল করবে এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে। প্রাথমিক আলোচনার পরে সুভাষ-চন্দ্রের বাড়ীতেই নেতৃস্থানীয় সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। স্থির হয় যে, ১৯১৫ সালে রাসবিহারীর নেতৃত্বে যেরূপ সেনা-বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐরূপ বিদ্রোহের প্রস্তুতি এখন থেকেই আরম্ভ হবে। বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেই সংযোগ স্থাপনের ভার এই বাহিনী গ্রহণ করল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই সৈন্য দলের প্রতি সমরাঙ্গণে যাওয়ার নির্দেশ হল। বাহিনী সে আদেশ অগ্রাহ্য করল। তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীদের গুলী করে হত্যা করা হল। অনেককে গ্রেপ্তার করা হল। এদিকে ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রেপ্তার হয়ে যান। অনুশীলনের অন্যান্য অনেক নেতাও গ্রেপ্তার হন। ফলে ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। জাপান তখনও যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, তিনি পূর্ব এশিয়ার পথে বাইরে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে একযোগে এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবেন। এই সময়ে জাপানী কনসাল অফিসে অনুশীলন কর্মী শ্রীজিতেন বসু কাজ করতেন। তাঁকে দিয়ে Vice-Consulকে ধরা হল। কিন্তু কিছু দিন পরেই বোঝা গেল জাপান অক্ষশক্তির অনুকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। তাই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করেই এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারত ত্যাগের চেষ্টা চলতে লাগল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আহ্বান করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতেই তিনি পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে জাপানে ডেকে পাঠান। তিনি এ সম্পর্কে সাভারকারের কাছে এক পত্র লেখেন। ১৯৪০ সালের বাইশে জুন সাভারকারভবনে সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য নেতাদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সুভাষচন্দ্রের জাপান যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিচালনাধীনে তখন কলকাতায় অন্ধকূপ হত্যা স্মারক অপসারণ আন্দোলন চলছিল। এজন্য তখনই তাঁর ভারত ত্যাগ সম্ভব হল না, সহকর্মী শঙ্করলালকে তিনি রাসবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ চলতে লাগল। কিন্তু এর সাত আট দিন পরেই ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র হঠাৎ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবই নূতন করে চিন্তা করতে হল। জেলে প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র কর্তব্য নির্ণয় করলেন। এই সময়ে আবার পূর্ব এশিয়া থেকে আহ্বান এল "জরুরী প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্রকে চাই।" সম্ভবতঃ জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার আভাস পেয়েই রাসবিহারী এই পত্র লিখেছিলেন। সুভাষচন্দ্রও বাইরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন। পরামর্শ করে জেলের বিভিন্ন দাবী নিয়ে অনুশীলনের কর্মীরা এবং সুভাষচন্দ্র অনশন আরম্ভ করলেন। অন্যান্য দলেরও কয়েকজন এ সঙ্গে ছিলেন। অনশনে দুর্বল হয়ে পড়লে জেলের ডাক্তারের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের বাইরে যাবার ব্যবস্থা হল। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সুভাষচন্দ্র এবং প্রতুল গাঙ্গুলীকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হল। শ্রীমতী বেলা মিত্রের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা হতে লাগল। সুভাষচন্দ্র এবং প্রতুলবাবুর মধ্যে আলোচনায় স্থির হল সীমান্তপথে বাইরে গিয়ে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবেন। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করলেন। স্থির হল, সুভাষচন্দ্র রুশিয়া পৌঁছলে প্রতুলবাবু এখান থেকে রওনা হবেন। কিন্তু তা সম্ভব হল না। ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী প্রচার হয়ে পড়লে প্রতুলবাবুকে পুনরায় জেলে আটক করা হল। সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করে কাবুলে গিয়ে সেখানকার রুশদূতকে সব জানালেন; কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সুভাষচন্দ্র বাধ্য হয়ে ইতালীয় দূতের শরণাপন্ন হলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ যাত্রার ব্যবস্থা করলেন; ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিন পৌঁছলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় স্থির হল, সুভাষচন্দ্র সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। জার্মানীর নিকট থেকে সাহায্য

জাতীয় ঋণ বলে গ্রহণ করা হবে এবং ভারত স্বাধীন হলে তা প্রত্যর্পণ করা হবে।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই রণাঙ্গনে জার্মানীর বিপর্যয় আরম্ভ হল এবং অক্ষ-শক্তির পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কাজকর্মও বেতার ঘোষণায় সীমাবদ্ধ ছিল।

এদিকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করলে ইংরেজ সেনানায়কগণ ভারতীয় সৈন্যদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে আসেন। রাসবিহারী এই পরিত্যক্ত সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীতে সেনানায়কদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্ণেল এন. এস. গিল, কর্ণেল রাঘবন, ক্যাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম এবং ক্যাপ্টেন কে. পি মেনন। এছাড়া অসামরিক নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন সিঙ্গাপুরের এডভোকেট এস. সি. গুহ এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী। স্বামী সত্যানন্দের পূর্ব নাম প্রফুল্ল সেন। রাসবিহারী আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন, তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল। কিন্তু জাপান কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিল না, নানাপ্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগল। ব্রহ্মের রণাঙ্গনে তারা ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে চাইল। কর্ণেল গিল এতে আপত্তি জানালেন। ফলে ১৯৪২ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান সরকার কর্ণেল গিলকে গ্রেপ্তার করে। মোহন সিং এ ব্যাপারে রাসবিহারীকে দায়ী করতে লাগলেন। মোহন সিং প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী হলেন। রাসবিহারী সমস্ত ব্যাপার কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হল। কিন্তু রাসবিহারী বুঝলেন এতে স্থায়ী ফল হবে না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পক্ষে সমরাঙ্গণে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা সম্ভব নয়। তিনি পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করলেন। জাপ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তা হল। হিটলার স্বীকৃত হলে ডুবো জাহাজে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে পৌঁছলেন।

এদিকে ভারতের অভ্যন্তরেও অনুকূল আবহাওয়া বইতে থাকে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসে "ইংরেজ ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমশ্রেণীর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। নেতৃত্বহীন জনসাধারণ দিশেহারা না হয়ে নিজেরাই নিজেদের পথ সৃষ্টি করে চলতে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ এবং সুভাষচন্দ্রেরও এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল। রাজপুতানার দেউলী বন্দীনিবাসে অনশন

ধর্মঘটের ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় যোগেশ চ্যাটার্জিকে ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। আগষ্ট আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে যোগেশবাবু আত্মগোপন করেন এবং পলাতক অবস্থায় থেকে উত্তর ভারতের আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য নরেন্দ্র দেও কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রীগোষ্ঠীকে পরিচালনা করছিলেন। অপর পক্ষে বন্দীনিবাসে বন্দীনিবাসেও তখন সমাজবাদী ভাবধারার প্রবল প্রভাব। অনু-শীলনের নেতৃবৃন্দও বুঝলেন, বিশের দশক থেকেই অবশ্য তাঁদের ভেতরে এ ধরণের চিন্তা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক সুশৃঙ্খল বিপ্লবী তরুণের সশস্ত্র অভিযানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে অভীষ্ট লাভ করা যাবে না। এর পিছনে গণসমর্থন ও গণ-সংগঠন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোন পথে চলা যায়? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট কর্ণধাব স্তালিনের 'পপুলার ফ্রন্ট' নীতি গলদপূর্ণ মনে করে অনুশীলনের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও সমাজবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভাবতে থাকেন।

১৯৩৮ সালে জেল থেকে বাইরে এসে অনুশীলন সি-এস-পি'র সঙ্গে মিলিত কাজকর্মের চেষ্টা করতে থাকে। সমিতির বিশিষ্ট কর্মী শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এবং কেশবপ্রসাদ শর্মা যখন দেউলী থেকে মুক্তি পান তাঁদের জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং নরেন্দ্র দেও-এর সঙ্গে মিলিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময় উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কাকোরী বন্দীদের মুক্তি দিলে যোগেশ চ্যাটার্জীও ত্রিদিব চৌধুরী এবং কেশবপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনজনে মিলে জয়প্রকাশ নারায়ণদের সঙ্গে আলাপ করেন। সি-এস-পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অনুশীলনের কর্মী ও সংগঠকরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তার মধ্য দিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু সি-এস-পি'র কর্মনীতি ও কৌশলেব সীমাবদ্ধতার দিকটা তাঁদের নজর এড়ায় নি। তাঁরা শ্রেণীভিত্তিক আলাদা সমাজবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে নেতাজী-আয়োজিত আপোষ-বিরোধী সম্মেলন উপলক্ষ্যে রামগড়ে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন। এও স্থির হয়, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও নতুন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল যথাসম্ভব একযোগে পরস্পরের সাথে সংহতি বজায় রেখে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাবে। ১৯৪২ সালে জনতা যখন স্বতঃস্ফূর্ত

সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করে তখন এই সংগঠন দুইটি তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীঅচ্যুৎ পট্টবর্ধন, শ্রীনরেন্দ্র দেও, শ্রীযোগেশ চ্যাটার্জি এবং শ্রীরামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের মেদিনীপুরে আগুন জ্বলে উঠল। টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার কাটা হল। জনসাধারণ গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করল। কোথাও কোথাও সরকার এরোপ্লেনের সাহায্যে আকাশ থেকে জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। যুক্তপ্রদেশের বালিয়া, আজমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়। বালিয়ায় পুলিশের গুলীতে পঁচিশ জন নিহত এবং প্রায় একশত আহত হয়। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা-দেশে একমাত্র তমলুকেই নিহত চল্লিশ ও আহত দুইশত। প্রায় তিন হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। দুইশত গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শতাধিক নারী ধর্ষিত হয়। আসামের নওগাঁ, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক আন্দোলন হয়। আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। আস্তি, চিমুর, বালিয়া, সাতারা, বিহার, মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলিশ ও সৈন্যরা জনতার উপর ক্ষিপ্ত কুকুরের মত লাফিয়ে পড়ে। ঘরদোর জ্বালিয়ে লুঠতরাজ-ধর্ষণ-নিপীড়নে মত্ত হয়ে ওঠে। একমাত্র ১৪ই সেপ্টেম্বরের গুলীতেই কাঁথিতে ৪০ জন নিহত হয়, ১৪০ জন নারী ধর্ষিত হয়। কাঁথিতে বেপরোয়া গুলী চালনা উপেক্ষা করে জনতা ডাকবাংলো, মদের দোকান, সরকারী অফিস, থানা প্রভৃতি পুড়িয়ে দেয়। অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে জনতার আদালতে বিচার করে তাদের দণ্ডিত করা হয়।

কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করে সফল করার মত শক্তি জনতার ছিল না। তার কারণ, আন্দোলন সশস্ত্র আকার ধারণ করলেও এই সশস্ত্র আন্দোলন চালাবার মত যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র জনতার হাতে ছিল না। বিপ্লবীরা তখন প্রায় সকলেই কারাগারে। তাঁরা বাইরে থাকলে অন্তত বোমা প্রস্তুত করে অস্ত্রের অভাব পূরণ করতে পারতেন। তাছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও জনতার ছিল না। এ সত্ত্বেও সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং বৎসরাধিক কাল টিকে ছিল। এর পরে আগুন নিভে যায়; সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের শেষভাগে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে 'দিল্লী চলো' অভিযান করেন তখন এ আগুন একেবারেই নিভে গেছে। তা না হলে ভিতরে ও বাইরে আগুন যদি একই সঙ্গে জ্বলে উঠত তা হলে ইংরেজের পক্ষে পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারত ত্যাগ করা সম্ভব হত না। ইংরেজের দেওয়া স্বাধীনতা না নিয়ে ভারতবাসী নিজেদের শক্তিতেই স্বাধীনতা অর্জন করত।

সুভাষচন্দ্রের আগমনে সমগ্র পূর্ব-এশিয়া উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। টোকিও থেকে ১৯৪৩ সালের ২৪শে জুন বেতার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমি ভারত-মাতার সন্তান, ভারতমাতার মুক্তি সাধনের জন্যই আমি প্রাণের জ্বালায় এখানে ছুটে এসেছি।" ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর পৌঁছলেন। ৪ঠা জুলাই বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতীয়গণ সিঙ্গাপুরে এসে সমবেত হলেন। প্রথমে রাসবিহারী বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, সমরাঙ্গণের দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা তাঁর নেই। যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে এ ভার তিনি অর্পণ করতে চান। সেই যোগ্যতম ব্যক্তি সুভাষচন্দ্র বসু। "তিনিই আমাদের নেতাজী, তিনিই আমাদের পরিচালক, আমাদের অধিনায়ক।" সেই বিশাল জনসমুদ্র অমনি জয়ধ্বনি করে উঠল—"জয়হিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কী জয়"। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর ভারতের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ঐদিন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, হংকং প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত হলেন। সুভাষচন্দ্র বলেন, "এই অস্থায়ী সরকারের প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্য রয়েছে। প্রতিটি ভারতবাসীকেই আমি ভারত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। আজাদ হিন্দ সরকার আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ২৩শে অক্টোবর জাপান এই সরকারকে স্বীকার করে নিলেন। পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অভূতপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে। সকলেরই মুখে 'দিল্লী চলো'। নারী-সেনাবাহিনী এবং বাল সেনাবাহিনীও গঠিত হল। ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারের অধিকারভুক্ত হল।

ক্রমে মাঞ্চুকো, জার্মানী, ইতালী, শ্যাম, নানকিং এবং ব্রহ্ম গভর্মেণ্টও আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করলেন। রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হল এবং এর পরে আরম্ভ হল আরাকানের ভিতর দিয়ে মণিপুর অভিযান। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান এবং ভারতীয় ফৌজের মিলিত অভিযান ভারতাভিমুখে যাত্রা করল। অভিযানের উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্র বলেন, "ঐ দূরে নদীর অপর পারে ঐ প্রান্তর ও বনের অপর দিকে পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘেরা আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি দেখা যাচ্ছে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের জন্মভূমি —আমাদের ভারতভূমি। ঐ দেশে আমরা জন্মেছি। ঐ দেশেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। ঐ শোনো মাতৃভূমির ক্রন্দনধ্বনি—শোনো ভারতের রাজধানী দিল্লীর আহ্বান—শোনো ৩৮ কোটি নরনারীর কাতর আকুতি, ঐ শোনো স্বজনের আকুল আহ্বান, ভারতবাসী আজ বুভুক্ষিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত। তারা আজ মৃত্যুর মুখে।

তাদের জন্য আত্মাহুতি দেবার সময় এসেছে। ওঠো বীরবৃন্দ, সুপ্ত সিংহ তোমরা জেগে ওঠ। বিশ্রামের সময় নেই। যোদ্ধাগণ, অস্ত্র ধারণ কর এবার। ঐ দেখ তোমাদের সম্মুখে পথ, আমাদের অগ্রগামিগণ আমাদের জন্য এ পথ রচনা করে গেছেন। এ পথ ধরে অগ্রসর হব আমরা। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ, সেই স্বাধীনতার পথেই অগ্রসর হও, চলো দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, সাম্রাজ্যবাদের শ্মশানক্ষেত্র রচনা কর।"

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রহ্ম-সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারা টামু হয়ে মণিপুর অঞ্চলে পৌঁছে নাগাপাহাড় আক্রমণ করল। এপ্রিল মাসে কোহিমা রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে ইম্ফল আক্রমণ করল তারা। মণিপুর অধিকার করে মণিপুরের জনগণ সহ নেতাজীর, নেতৃত্বে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হবে, এই ছিল পরিকল্পনা। ইম্ফলের যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু এর পরেই আরম্ভ হল অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। এপ্রিল মাসে আরম্ভ হল অসময়ে প্রবল বর্ষা। নদনদী কানায় কানায় ভরে গেল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার পথ রুদ্ধ হল। বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হল। জাপানের নিকট থেকে সাহায্য চেয়ে পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হয়ে বাহিনীকে পিছু হঠতে হল। কিন্তু উপবাসী থেকেও বাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। তাদের আশা স্বাধীনতার নতুন ইতিহাস তারা রচনা করবে।

এদিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সুযোগ বুঝে এবারে রেঙ্গুনের পথে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করল। সুভাষচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। আজাদ হিন্দ বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে জাপান ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করল। কিন্তু তবুও সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর মূল সৈন্যদল কয়েক মাস ধরে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালাল। এই সময়ে ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী রাসবিহারী বসু দেহত্যাগ করলেন। ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী ক্রমে পেগু পর্যন্ত অগ্রসর হল। সুভাষচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে রেঙ্গুন ত্যাগ করতে হল। বিদায় ভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন, "বন্ধুগণ, এই সংকট সময়ে আপনাদিগকে বলার মত আমার একটা কথাই আছে। আজ আমরা পরাজিত হলেও এ পরাজয় যেন আপনাদের বিন্দুমাত্র ম্লান না করে। আপনারা বীরের ন্যায় সংগ্রাম করেছেন। এই সাময়িক পরাজয়ও বীরের মত সুশৃঙ্খলভাবে বরণ করতে হবে।"

রেঙ্গুন থেকে সুভাষচন্দ্র মৌলমিন হয়ে ব্যাঙ্ককে যান। তারপরে জুন মাসের প্রথম ভাগে সেখান থেকে যান মালয়ে। ১৯৪৪ সালের ১৬ই আগষ্ট

তিনি সিঙ্গাপুর থেকে কর্ণেল হবিবুর রহমান প্রভৃতিকে নিয়ে টোকিও যাত্রা করেন। তার পরেই হবিবুর রহমানের কথা অনুসারে বলতে হবে, তাইহুকো বিমান দুর্ঘটনা এবং এই দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু। কিন্তু এই বিমান দুর্ঘটনার কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তদন্ত কমিশনের সদস্য শ্রীসতীশচন্দ্র বসুও এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র আজও জীবিত আছেন এটাই আমরা আশা করি। তিনি বেঁচে থাকুন কি না থাকুন তিনি চিরদিনই ভারতবাসীর কাছে অমর। একটি কথা আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা কেউ কাউকে দান করে না। ইংরেজও আমাদের স্বাধীনতা দান করে নি। পরাধীন জাতি স্বাধীনতা নিজ শক্তিতে অর্জন করে। আমরাও স্বাধীনতা নিজ শক্তিতে অর্জন করেছি। কিন্তু এর মধ্যে কতকটা আপোষের দিক আছে। যুদ্ধের শেষে বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। এই সন্ধি চুক্তিতে আমরা কিছুটা হীন শর্ত মেনে নিয়েছি।

এই হীন শর্ত হল দেশবিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টি। সুভাষচন্দ্রের দিল্লী অভিযান সফল হলে হয়ত এই হীন শর্ত আমাদের মানতে হত না।